হারিয়ে যাওয়া মুক্তো

হারিয়ে যাওয়া মুক্তো

শিহাব আহমেদ তুহিন

হারিয়ে যাওয়া মুক্তো

ISBN: ৯৭৮-৯৮৪-৩৪-৪৫৬৩-৬

শার‘ঈ সম্পাদনা
শায়খ ড. আবু বকর মুহাম্মাদ যাকারিয়া

প্রথম প্রকাশ
মে, ২০১৮
দ্বিতীয় প্রকাশ
আগস্ট ২০১৮

প্রকাশক
রোকন উদ্দিন

অনলাইন পরিবেশক
রকমারি.কম
সিজদাহ. কম

প্রচ্ছদ : মাসুম আনসারী

পৃষ্ঠাসজ্জা,মুদ্রণ ও বাঁধাই সহযোগিতায়
বই কারিগর ০১৯৬ ৮৮ ৪৪ ৩৪৯

মূল্য: ২০০ টাকা

৩৪, মাদরাসা মার্কেট, বাংলাবাজার, ঢাকা।
+৮৮ ০১৭৭৯ ১৯ ৬৪ ১৯
facebook.com/somorponprokashon

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّـهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّـهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّـهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ

“বল, যদি তোমরা আল্লাহকে ভালবাসো, তাহলে আমার অনুসরণ করো। আল্লাহ্ তোমাদেরকে ভালোবাসবেন এবং তোমাদের পাপসমূহ্ ক্ষমা করে দেবেন। আর আল্লাহ্ অত্যন্ত ক্ষমাশীল। পরম দয়ালু।”

[সূরা আলে-ইমরান ৩:৩১]

বিষয়সূচি

লেখকের কথা

যিনি আমাদের মায়ের চেয়েও বেশি ভালোবাসেন, সকল প্রশংসা সেই মহান রবের। কিয়ামতের মতো কঠিন সময়েও যিনি আমাদের কথা ভুলে যাবেন না, দরূদ ও সালাম বর্ষিত হোক সেই নবি ﷺ-এর ওপর।

একসময় মুসলিমরা ছিল সবার ওপরে। ভালোভাবে লক্ষ করলে দেখা যাবে, যে সময়ে আমরা আল্লাহর কিতাব ও রাসূল ﷺ-এর সুন্নাহ আঁকড়ে ধরেছিলাম, সে সময়ে আল্লাহ তা'আলা আমাদের সম্মানিত করেছেন। আর যখন আমরা ইসলাম ছাড়া অন্য কিছুতে সম্মান খুঁজেছি, রাসূল ﷺ-এর সুন্নাহর চেয়ে অন্য কিছুকে শ্রেষ্ঠ ভেবেছি, তখন পদে পদে লাঞ্ছিত হয়েছি।

সাহাবিদের জীবনে তাকালে দেখা যাবে, তাঁরা সুন্নাহ মেনে চলার ব্যাপারে ছিলেন খুবই সতর্ক। যতভাবে রাসূল ﷺ-এর সুন্নাহকে মেনে চলা যায়, ততভাবেই তাঁরা মানার চেষ্টা করেছেন। আনাস رضي الله عنه একদিন রাসূল ﷺ-কে তরকারির মধ্যে লাউয়ের টুকরোগুলো বেছে বেছে খেতে দেখেছিলেন। ব্যস, এতটুকু দেখেই তিনি নিজের জন্য লাউ পছন্দ করিয়ে নিয়েছিলেন। অথচ না কখনো রাসূল ﷺ তাঁকে লাউ খাবার নির্দেশ দিয়েছেন, না এর কোনো ফযীলত বর্ণনা করেছেন।

ভ্রমণের সময় আব্দুল্লাহ ইবনে উমার رضي الله عنهما মক্কা ও মদিনার মধ্যবর্তী স্থানে যেতেন এবং দুপুরবেলা গাছের ছায়ায় বিশ্রাম নিতেন। কারণ, তিনি রাসূল ﷺ-কে একই জায়গায় একইভাবে বিশ্রাম নিতে দেখেছেন। একদিন ভ্রমণের সময় রাসূল ﷺ প্রাকৃতিক ডাকে সাড়া দিতে এক জায়গায় থেমেছিলেন। সফরে বের হলে আবদুল্লাহ

ইবনে উমার ﵄-ও সে জায়গায় থেমে প্রাকৃতিক ডাকে সাড়া দিতেন। কুররা ইবনে ইয়াস ﵁ যখন রাসূল ﷺ-এর হাতে বাইয়াত নিতে এসেছিলেন, তখন তিনি লক্ষ করলেন রাসূল ﷺ-এর জামার বোতাম খোলা রয়েছে। এ জন্য শীতে কিংবা গরমে কখনো তিনি জামার বোতাম লাগাতেন না।

আমরা হয়তো এই উদাহারণগুলো কট্টরতা ভাবতে পারি। তবে তাঁরা এগুলো করতেন রাসূল ﷺ-এর প্রতি ভালোবাসা থেকে। তাই তো দুনিয়া ও আখিরাতে আল্লাহ তা'আলা তাঁদের প্রতি সন্তুষ্ট, তাঁরাও আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট।

নি:সন্দেহে পৃথিবীতে যত মানুষ এসেছেন, তাদের মধ্যে রাসূল ﷺ ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে তিনি দৃষ্টান্ত স্থাপন করে গেছেন। আর তাঁর দৃষ্টান্তই সর্বশ্রেষ্ঠ। আমরা যদি তাঁকে ভালোবেসে সে সুন্নাহগুলোর অনুসরণ করি, তবে আল্লাহ তা'আলাও আমাদের ভালোবাসবেন-

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّـهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّـهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّـهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ

"বলো, যদি তোমরা আল্লাহকে ভালোবাসো, তাহলে আমার অনুসরণ করো। আল্লাহ তোমাদের ভালোবাসবেন এবং তোমাদের পাপসমূহ ক্ষমা করে দেবেন। আর আল্লাহ অত্যন্ত ক্ষমাশীল। পরম দয়ালু।"[১]

➥ কেন সুন্নাহ অনুসরণ করতে হবে?

শায়খ সালিহ আল মুনাজ্জিদ এই প্রশ্নের উত্তরে লিখেছেন, "রাসূল ﷺ-এর সুন্নাহ হচ্ছে আমাদের মুক্তির বাহন। নিরাপদ আশ্রয়স্থল। রাসূল ﷺ আমাদের সুন্নাহ অনুসরণ করতে বলেছেন। অবহেলা করতে নিষেধ করেছেন। তিনি বলেছেন,

فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الْمَهْدِيِّينَ الرَّاشِدِينَ تَمَسَّكُوا بِهَا وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ

'তোমরা অবশ্যই আমার এবং আমার পরে খোলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাহ মেনে চলবে। এগুলো মেনে চলবে এবং শক্ত করে আঁকড়ে ধরবে। আর (ধর্মের ব্যাপারে) সকল নতুন উদ্ভাবিত বিষয়ে সাবধান। কেননা, সকল নব-

[১] সূরা আলে-ইমরান ৩:৩১

উদ্ভাবিত বিষয় হচ্ছে বিদআত। আর সকল বিদআত হচ্ছে পথভ্রষ্টতা।'[১]

বিদআত এবং ফিতনা যখন প্রাধান্য বিস্তার করবে, তখন যারা সুন্নাহ মেনে চলবেন তাদের বেশি পুরস্কার দেয়া হবে। তাদের মর্যাদা থাকবে অনেক ওপরে। কারণ, ঘোর অন্ধকারের মধ্যে থেকেও তারা গুরাবা (অপরিচিত) হিসেবে বেঁচেছেন। মানুষকে সঠিক পথে আনার চেষ্টা করেছেন। রাসূল ﷺ বলেছেন,

إِنَّ الإِسلَامَ بَدَأَ غَرِيبًا ، وَسَيَعُودُ غَرِيبًا كَمَا بَدَأَ ، فَطُوبَى لِلغُرَبَاءِ

'ইসলাম অপরিচিত অবস্থায় এসেছে। আর এটা শুরুর মতোই অপরিচিত অবস্থায় ফিরে যাবে। তাই অপরিচিতদের জন্য সুসংবাদ।'

জিজ্ঞেস করা হলো, 'হে আল্লাহর রাসূল! তারা (অর্থাৎ, এই অপরিচিতরা) কারা?' তিনি বললেন,

الذِينَ يَصلُحُونَ إِذَا فَسَدَ النَّاسُ

'যখন মানুষ নীতিভ্রষ্ট হবে, তখনো তারা ন্যায়পরায়ণ থাকবে।'[২]

রাসূল ﷺ আরও বলেছেন, 'সামনে তোমাদের জন্য রয়েছে ধৈর্যের সময়। সে সময় ধৈর্য অবলম্বন করা জ্বলন্ত অঙ্গার ধরে রাখার মতোই কঠিন হবে। (সে সময়ে) যারা ভালো কাজ করবে, তারা পঞ্চাশ জনের সমপরিমাণ পুরস্কার পাবে।'

জিজ্ঞেস করা হলো, 'হে আল্লাহর রাসূল! তাদের পঞ্চাশ জনের সমপরিমাণ?'

রাসূল ﷺ বললেন, 'তোমাদের পঞ্চাশ জনের সমপরিমাণ।'[৩]

কোনো কোনো বর্ণনায় এসেছে, 'তারা হচ্ছে সেসব ব্যক্তি, যারা আমার সুন্নাহকে

---

[১] হাদিসটি আবু দাউদ (৪৬০৭) উল্লেখ করেছেন এবং আলবানী ﷺ একে সহীহ বলেছেন তার *সহীহ আবু দাউদ* গ্রন্থে।

[২] আলবানী ﷺ হাদিসটিকে সহীহ বলেছেন তার *সিলসিলা সহিহাহ* গ্রন্থে (১২৭৩)। হাদিসটি *সহীহ মুসলিম* গ্রন্থেও বর্ণিত আছে (১৪৫)।

[৩] হাদিসটি আবু দাউদ (৪৩৪১) এবং তিরমিযী (৩০৮৫) উল্লেখ করেছেন। আলবানী ﷺ হাদিসটিকে সহীহ বলেছেন তার *সিলসিলাহ সহিহাহ* (৪৯৪) গ্রন্থে।

জীবিত করবে এবং মানুষকে তা শেখাবে’।”[৪]

রাসূল ﷺ আরো বলেছেন,

إِنَّهُ مَنْ أَحْيَا سُنَّةً مِنْ سُنَّتِي قَدْ أُمِيتَتْ بَعْدِي، فَإِنَّ لَهُ مِنَ الأَجْرِ مِثْلَ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا

“যে আমার পরে আমার এমন কোনো সুন্নাহ জীবিত করবে যা ভুলে যাওয়া হয়েছে, যতজন লোক ঐ সুন্নাহর ওপর আমল করবে, তাকে সমপরিমাণ পুরস্কার দেয়া হবে। যারা আমল করছে তাদের থেকে কোনো সওয়াব কমানো হবে না।”[৫]

ইবনে উসাইমিন رحمه الله বলেছেন,

كلما سمحت الفرصة لنشر السنة فانشرها؛ يكن لك أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة

“যদি কারো সামনে সুন্নাহ জীবিত করার সুযোগ আসে, তবে সে যেন তা করে। কিয়ামত পর্যন্ত যতজন সে সুন্নাহর ওপর আমল করবে, আপনি তার জন্যে সওয়াব পেতে থাকবেন।”[৬]

একজন মুসলিম হিসেবে তাই আমাদের সবার কাছে সুন্নাহর গুরুত্ব স্পষ্ট। রাসূল ﷺ-এর হাদিসের মাধ্যমে আমরা এটাও বুঝতে পেরেছি; ফিতনার সময়ে সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরা, মানুষকে ভুলে যাওয়া সুন্নাহ স্মরণ করিয়ে দেয়া এবং হারানো সুন্নাহকে জীবিত করার মর্যাদা কতখানি। ঈমানের দাবিদার কোনো মুসলিমই এটা থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখতে পারে না।

রাসূল ﷺ-এর হারানো সুন্নাহকে পুনরুজ্জীবিত করার তাড়না থেকেই *হারিয়ে যাওয়া মুক্তো* বইটির জন্ম। আমার জন্য কাজটি একেবারেই সহজ করে দিয়েছেন

[৪] শায়খের সম্পূর্ণ উত্তরটি পড়ুন: فضل التمسك بالسنة زمن انتشار الفساد
https://islamqa.info/ar/89878

[৫] সুনানে তিরমিযী, হাদিস নংঃ ২৬৭৭। আলবানী (রহ) এর মতে হাদিসটি হাসান, সহীহ ও যঈফ সুনানে তিরমিযী, ৬/১৭৭

[৬] শরহু রিয়াদুস সলেহীন, ৪/২১৫

উস্তাদ আলী হাম্মুদা (হাফি)। বিশ্ববিদ্যালয় জীবনের শুরুতে উস্তাদ আলী হাম্মুদার (হাফি) লেকচারের সাথে পরিচয়। খুব দরদ দিয়ে কথা বলেন। উস্তাদ লেখেনও বেশ ভালো। শুরু থেকেই তার *Daily Revivals* সিরিজটি খুব ভালো লাগত। তিনি সেখানে এমন চল্লিশটি বিষয় নিয়ে এসেছেন যা রাসূল ﷺ ও সাহাবি رضي الله عنهم-এর মধ্যে প্রচলিত ছিল, কিন্তু এখন হারিয়ে গেছে। সে সিরিজগুলো নিজের মতো করে লিখতে থাকি *হারিয়ে যাওয়া মুক্তো* নামে। আল্লাহর সহায়তায় এটা এখন বইয়ের রূপ পেয়েছে।

ইমাম নববী رحمه الله *হাদিসুল আরবাইন* বা চল্লিশ হাদিস নামে একটি বই লিখেছিলেন। নাম চল্লিশ হাদিস হলেও সেখানে হাদিস ছিল মোট ৪২টি। ইমাম নববী رحمه الله-এর প্রতি ভালোবাসা থেকে আমার ইচ্ছা ছিল উস্তাদ আলী হাম্মুদার (হাফি) সিরিজটির সাথে আরো ২টি অধ্যায় যুক্ত করে মোট ৪২টি অধ্যায়ে বইটি সাজানোর। তবে শেষ মুহূর্তে বইটির শার'ঈ সম্পাদকের পরামর্শে একটি অধ্যায় বাদ দেয়ায় সে ইচ্ছা পূরণ হয়নি। ৪১টি অধ্যায়ে বইটি সাজাতে হয়েছে।

শায়খ আবু বকর মুহাম্মাদ যাকারিয়া (হাফি) তার সীমাহীন ব্যস্ততা সত্ত্বেও যত্নের সাথে বইটি নিরীক্ষণ করে দিয়েছেন। আমি আল্লাহর কাছে চাই তিনি যেন শায়খকে দুনিয়া ও আখিরাতে সম্মানিত করেন।

আমি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি, উস্তাদ আবদুর রহমানকে (হাফি) যিনি আমাকে বেশ কিছু ক্ষেত্রে তথ্য দিয়ে সহায়তা করেছেন। কুয়েটের দ্বীনি ভাইরা বিভিন্ন সময়ে আমাকে অনুপ্রেরণা দিয়েছে। তাদের জন্যেও রয়েছে অশেষ ভালোবাসা ও কৃতজ্ঞতা। বইটির প্রকাশক রোকন ভাই সব সময় আমাকে উৎসাহ দিয়ে গিয়েছেন। আল্লাহ তা'আলা যেন তাকে আরও বেশি বেশি ইসলামের খেদমত করার তৌফিক দেন সে দু'আই করি।

আমি আশা করব, এ বইটি পড়ে সবাই সুন্নাহকে অন্যভাবে দেখতে শিখবেন। ভালোবাসতে শিখবেন। তারা বুঝতে শিখবেন, সুন্নাহ মানে শুধু যোহরের আগের চার রাকাত কিংবা মাগরিবের পর দুই রাকাত সালাত নয়। সুন্নাহ হতে পারে দুপুর বেলা ঝুম বৃষ্টিতে ভেজা। কোথাও পরিষ্কার মাটি দেখলে খালি পায়ে হাঁটা। সারাদিনের ক্লান্তি শেষে রাতের বেলা প্রিয়তমার সাথে হাঁটা। তার সাথে মিষ্টি মিষ্টি কথা বলা।

একমাত্র কুরআনই হচ্ছে বিশুদ্ধ বই। এ ছাড়া সব বইতেই কম-বেশি ভুলভ্রান্তি রয়েছে। এ বইও তার ব্যতিক্রম নয়। বইটিতে ভালো যা কিছু আছে তা আসমান ও জমীনের রব আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে। আর ভুল যা কিছু আছে তা আমার ও শয়তানের পক্ষ থেকে। বইটি কোনো পাঠকের বিন্দুমাত্র উপকার আসলে তার নিকট আমার অনুরোধ থাকবে, তিনি যেন অবশ্যই আমার জন্য দু'আ করেন। দু'আ করেন যেন আমি আমার জীবনটাকে সুন্নাহ্ দিয়ে সাজাতে পারি। ফিতনাকে পাশ কাটিয়ে সরলপথে চলতে পারি।

নিশ্চয়ই হিদায়াত কেবল আল্লাহ্ সুবহানু তা'আলার পক্ষ থেকেই আসে।

শিহাব আহমেদ তুহিন
yshihab05@gmail.com
১৪ শাবান, ১৪৩৯ হিজরি
কুয়েট, খুলনা।

বহুলব্যবহৃত চিহ্ন

ﷺ ‘সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম’/ আল্লাহ তাঁর উপর করুণা ও শান্তি বর্ষণ করুন! (মুহাম্মাদ ﷺ-এর নামের পর ব্যবহৃত হয়।)

عليه السلام ‘আলাইহিস সালাম’/ তাঁর উপর শান্তি বর্ষিত হোক! (সাধারণত নবিদের নামের পর ব্যবহৃত হয়।)

عليها السلام ‘আলাইহাস সালাম’/ তাঁর উপর শান্তি বর্ষিত হোক! (মহীয়সী নারীর নামের পর ব্যবহৃত হয়।)

عليهما السلام ‘আলাইহিমাস সালাম’/ উভয়ের উপর শান্তি বর্ষিত হোক! (দুজন নবির নাম একসাথে এলে, শেষোক্ত নামের পর ব্যবহৃত হয়।)

عليهم السلام ‘আলাইহিমুস সালাম’/ তাঁদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক! (দুয়ের অধিক নবির নাম একসাথে এলে, শেষোক্ত নামের পর ব্যবহৃত হয়।)

رضي الله عنه ‘রদিয়াল্লাহু আনহু’/ আল্লাহ তাঁর উপর সন্তুষ্ট হোন! (সাহাবির নামের পর ব্যবহৃত হয়।)

رضي الله عنها ‘রদিয়াল্লাহু আনহা’/ আল্লাহ তাঁর উপর সন্তুষ্ট হোন! (মহিলা সাহাবির নামের পর ব্যবহৃত হয়।)

رضي الله عنهما ‘রদিয়াল্লাহু আনহুমা’/ আল্লাহ উভয়ের উপর সন্তুষ্ট হোন! (দুজন সাহাবির নাম একসাথে এলে, শেষোক্ত নামের পর ব্যবহৃত হয়।)

رضي الله عنهم ‘রদিয়াল্লাহু আনহুম’/ আল্লাহ তাঁদের উপর সন্তুষ্ট হোন! (দুয়ের অধিক সাহাবির নাম একসাথে এলে, শেষোক্ত নামের পর ব্যবহৃত হয়।)

رضي الله عنهن ‘রদিয়াল্লাহু আনহুন্না’/ আল্লাহ তাঁদের উপর সন্তুষ্ট হোন! (দুয়ের অধিক মহিলা সাহাবির নাম একসাথে এলে, শেষোক্ত নামের পর ব্যবহৃত হয়।)

رحمه الله ‘রহিমাহুল্লাহ’/ আল্লাহ তাঁর প্রতি দয়া করুন! (যে কোনো সৎ ব্যক্তির নামের পর ব্যবহৃত হয়।)

মনের কথা

শত শত বছর ধরে বিজ্ঞানীরা একটি পদার্থ বানানোর জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করে গেছেন। তাদের জীবনের লম্বা একটি সময় এই বস্তু তৈরির স্বপ্ন দেখেছেন। কী সেই বস্তু? সবাই একে ডাকত 'ফিলোসফারস স্টোন' নামে। যার এক ছোঁয়ায় লোহা, সিসার মতো সস্তা ধাতু স্বর্ণে পরিণত হতো। যেসব বিজ্ঞানীরা এটা তৈরির জন্য গবেষণা করতেন, তাদের বলা হতো 'আলকেমিস্ট'।

আমাদের জন্য এটা গাঁজাখুরি গল্প ছাড়া কিছুই না। বারে! তা হয় কী করে? একটা বস্তুর ছোঁয়ায় সবকিছু সোনা হয়ে যাবে! তবে আলকেমিস্টরা কিন্তু সত্যিই বিশ্বাস করতেন এমন বস্তুর অস্তিত্বে। আইজাক নিউটন, রবার্ট বয়েলের মতো বাঘা বাঘা বিজ্ঞানীরা এর পেছনে ঘণ্টার পর ঘণ্টা নষ্ট করেছেন। কিন্তু সেই অমূল্য পাথরের কোনো হদিস পাননি।

তবে সত্যি বলতে কী এমন বস্তুর অস্তিত্ব কিন্তু আসলেই রয়েছে। এমনকি আমাদের হাতের নাগালেই রয়েছে। আমরা চাইলেই পারি সেই পরম আরধ্য পাথরটিকে নিজের করে নিতে। কিন্তু আমরা না তাকে কোনো গুরুত্ব দিই, না একে বিশুদ্ধ করার দিকে কোনো নজর দিই। সেটা হচ্ছে—নিয়ত[১] বা উদ্দেশ্য।

অনেকের ভ্রু হয়তো বিরক্তিতে কুঁচকে উঠেছে। কেউ কেউ হয়তো মনে মনে বলছেন, "আরে এটা আর ওটা কি এক হলো নাকি?"

---

[১] النية (নিয়ত)। আল কারাফি ﷺ বলেন, "(নিয়ত হচ্ছে) মানুষের মনের ইচ্ছা।" (আয-যাখিরাহ : ১/২৪০)

আসলেই তো। এটা আর ওটা কখনোই এক না। কারণ, নিয়ত তো আর লোহাকে স্বর্ণে পরিণত করতে পারে না। নিয়তের ক্ষমতা নেই ক্ষণস্থায়ী কোনো পদার্থকে অন্য এক পদার্থে পরিণত করার। তবে আমাদের নিয়ত এমন এক কাজ করতে পারে যা কোনো জাদুর পাথরই করতে পারবে না। নিয়তই পারে আমাদের প্রতিদিনের সাধারণ কাজগুলোকে অসাধারণ করে তুলতে। সামান্য কাজগুলোকে চিরস্থায়ী আমলে পরিণত করতে। জান্নাতের পাথেয় হতে।

খাওয়া, ঘুমানো, ঘোরাঘুরি করা, পড়াশোনা করা, মানুষের সাথে মেশা, বিশ্রাম নেয়া—আমরা প্রতিদিনই এ কাজগুলো করি। এর মধ্যে কিছু কাজ করি অর্থের জন্য, কিছু কাজ নিজেকে বিশ্রাম দেয়ার জন্য, আর কিছু নিছক বিনোদনের জন্য। আমাদের করা প্রতিটা কাজই একসময় হারিয়ে যাবে তা যতই মূল্যবান হোক না কেন। তবে যদি প্রত্যেকটা কাজের সাথে আমরা ভালো নিয়তকে যুক্ত করতে পারি, তবে তা পরিণত হয় চিরস্থায়ী সম্পদে।

এ কারণেই সালাফগণ তাদের সব কাজের সাথে নিয়তের ব্যাপারটি ভালোমতো জুড়ে আছে কি না সেদিকে কড়া দৃষ্টি রাখতেন।

মুআ‘য ইবনে জাবাল ﵁ বলতেন,

> “আমি ঘুমাই তারপর ইবাদত করার জন্য রাতে উঠি। আর আমি আল্লাহর কাছে আমার ঘুমানোর জন্য পুরস্কার আশা করি, যেমনটা আশা করি আমার জাগরণের জন্য।”[২]

তিনি ঘুমাতেন। তবে ঘুমানোর আগে নিয়ত করে নিতেন যেন এ ঘুম তাকে নতুন উদ্যমে ইবাদত করতে শক্তি জোগায়। শেষরাতের নিস্তব্ধ নীরবতায় বহুক্ষণ তার রবের সামনে দাঁড়িয়ে থাকার সামর্থ্য এনে দেয়। তাই ঘুমিয়েও তিনি সওয়াবের আশা করতেন।

ইবনে আবু জামরা ﵀ বলতেন,

> “আমার ইচ্ছা হয়, যেন আলেমরা তাদের পুরোটা সময় দিয়ে মানুষকে আমলের জন্য নিয়তকে ঠিক করতে শিক্ষা দেবেন। কিছু আলেম বসে বসে

[২] সহীহ মুসলিম, হাদিস নং : ১৭৩৩

মানুষকে আর কিছু না শিখিয়ে শুধু এটাই শেখাবেন। কেননা, শুধু নিয়তে ঘাটতিই বহু মানুষের জীবনে ধ্বংস ডেকে আনে।”[৩]

ইবনে আবু জামরা ﷺ-এর কথাটা শুনতে অবাক লাগতে পারে। তবে একবার চিন্তা করে দেখুন তো এত ভালো ভালো কাজ করে কী লাভ যদি সেটা আল্লাহ তা‘আলা কবুলই না করেন? যদি সেটা আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য না করে শুধু মানুষের সন্তুষ্টির জন্য করা হয়?

এক শিক্ষকের গল্প বলি। তিনি সহ আরও বেশ কয়েকজন ইয়ামেনের এক শায়খের দারসে বসে ছিলেন। দারসটি সে শায়খের বাসাতেই হচ্ছিল। হঠাৎ করে একজন দরজায় কড়া নাড়ল। শব্দ শুনে সে শিক্ষক দরজা খুলতে গেলেন। কিন্তু শায়খ তাকে থামিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, “তুমি কী করতে চাচ্ছ?”

শিক্ষক তখন বললেন, “আমি দরজা খুলতে যাচ্ছি।”

শায়খ আবার জিজ্ঞেস করলেন, “শুধু দরজাই খুলতে যাচ্ছ?”

তিনি জবাব দিলেন, “হাঁ।”

এটা শুনে শায়খ বললেন, “তাহলে আমাকেই দরজা খুলতে দাও।”

শায়খ দরজা খুললেন। আবার দারসে এলেন। তারপর সেই শিক্ষকের উদ্দেশে বললেন, “তুমি তো শুধু দরজাই খুলতে চেয়েছিলে। তাই আমি তোমাকে থামিয়ে দিয়েছি।

➡ আর আমি চেয়েছি :

➢ আমার ভাইকে সাহায্য করতে।[৪]

➢ তার দিকে মুচকি হেসে সুন্নাহ পালন করতে।[৫]

[৩] আল মাদখাল : ১/৬

[৪] রাসূল ﷺ বলেছেন, “কেউ যদি তার ভাইয়ের প্রয়োজন পূরণ করে দেয়, তবে আল্লাহ তা‘আলা তার প্রয়োজন পূরণ করে দেবেন।” (সহীহ মুসলিম, হাদিস নং : ২৫৮০)

[৫] রাসূল ﷺ বলেছেন, “তোমার ভাইয়ের সামনে তোমার হাসি হচ্ছে সদকাস্বরূপ।” (সুনানে তিরমিযী, হাদিস নং : ১৯৫৬)

➢ তাকে সালাম দিয়ে অভিবাদনের সুন্নাহ পালন করতে।[৬]

➢ তার সাথে মুসাফাহা করে আরেকটি সুন্নাহ পালন করতে।[৭]

➢ আমার পাশে তাকে বসার জায়গা করে দিতে।

➢ অতিথিকে সম্মান করার সুন্নাহ পালন করতে।[৮]

সুবহানাল্লাহ! সামান্য একটি কাজকে কীভাবে তিনি পরতে পরতে সুন্নাহ দিয়ে সাজিয়ে ইবাদতে পরিণত করেছেন, তা চিন্তা করলেও অবাক হয়ে যেতে হয়। যারা সত্যিই আল্লাহ তা'আলার ইবাদত করেন, তারা এভাবেই নিজের জীবনের প্রতিটা কাজকে ইবাদতে পরিণত করেন। দুনিয়ার সকল কাজের পেছনে তাদের একমাত্র উদ্দেশ্য থাকে আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি। আর যদি কখনো আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি ছাড়া শুধু পার্থিব স্বার্থ হাসিলের জন্য কোনো কাজ করে ফেলেন, তবে তারা অনুতপ্ত হন। তখন তাদের দেখলে মনে হয় যেন তারা মস্ত বড় গুনাহ করে ফেলেছেন।

তবে নিজের পুরো জীবনকে আল্লাহর ইবাদতে কাটিয়ে দেয়া একেবারে সহজ কথা নয়। জীবন মানে তো কিছু দিনেরই সমষ্টি। তাই দিন থেকেই শুরু করা যাক।

➡ একটা কাগজ নিয়ে ঝটপট তিনটি কলাম করে ফেলুন :

❖ সকাল ৯টা থেকে বিকাল ৫টা।

❖ বিকাল ৫টা থেকে রাত ১১টা।

❖ রাত ১১টা থেকে সকাল ৯টা।

এবার প্রতিটি কলাম নিয়ে আলাদাভাবে চিন্তা করুন। এই সময়ে আপনি কী কী করেছেন তা নিয়ে গভীরভাবে ভাবুন। কোনোকিছুই বাদ দেবেন না। খাওয়া-দাওয়া থেকে শুরু করে এমনকি বাথরুমে যাওয়ার ব্যাপারটাও না। এবার চিন্তা করে দেখুন, এর মধ্যে কোন কোন কাজগুলো আপনি আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টির জন্য করেছেন। কাজটা হয়তো দুনিয়াকেন্দ্রিক হতে পারে, কোনো সমস্যা নেই। তবে লক্ষ্য রাখুন আপনি সেখানেও আল্লাহর কাছ থেকে সওয়াব আশা করেছেন

[৬] একব্যক্তি রাসূল ﷺ-কে জিজ্ঞেস করল, "ইসলামের সর্বোত্তম দিক কোনটি?" তিনি বললেন, "অপরকে খাওয়ানো আর চেনা-অচেনা সবাইকে সালাম দেয়া।" (সহীহ বুখারি, হাদিস নং : ১২)

[৭] রাসূল ﷺ বলেছেন, "যখন দুইজন মুসলিম একে অপরের সাথে সাক্ষাৎ করে আর হাত মেলায়, তারা আলাদা হবার আগেই তাদের গুনাহসমূহ মাফ করে দেয়া হয়।" (আবু দাউদ, হাদিস নং : ৫২১২)

[৮] রাসূল ﷺ বলেছেন, "যে আল্লাহ ও কিয়ামতের ওপর বিশ্বাস রাখে, সে যেন তার অতিথিকে সম্মান করে।" (সহীহ বুখারি, হাদিস নং : ৬১৩৮)

কি না! যেমনটা করতেন মু‘আয ইবনে জাবাল ﵁। এবার দেখুন প্রতিটা কলামে আপনি কয়টি কাজ রাখতে পারছেন! এভাবে আমরা নিজেই নিজেকে মূল্যায়ন করতে পারি।

নিজের নিয়তকে ঠিক করতে দরকার কঠোর অধ্যবসায়। তাই চেষ্টা চালিয়ে যান। বারবার নিজেকে প্রশ্ন করুন, "আচ্ছা! আমি যে কাজটা করছি, সেটা কি আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য নাকি মানুষের সন্তুষ্টির জন্য? সেটা কি চিরস্থায়ী আখিরাতের জন্য না ক্ষণস্থায়ী দুনিয়ার জন্য?" একসময় দেখবেন কলামগুলো আস্তে আস্তে ফাঁকা থেকে ভরাট হচ্ছে। আপনার জীবনের প্রতিটা কাজই উত্তম নিয়ত দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে।

এভাবে যে নিজের জীবনে করা প্রতিটা সাধারণ কাজকে ইবাদতে পরিণত করতে পারে তার চেয়ে সফল আর কে হতে পারে? আর তার চেয়ে দুর্ভাগা আর কে হতে পারে, যে নিজের ইবাদতকে দিনের পর দিন আরও সাধারণ করে ফেলে?

হয়তো এতক্ষণে আমাদের কাছে পরিষ্কার হয়ে গেছে কেন ইমাম বুখারি ﵀ তার বিখ্যাত হাদিসগ্রন্থটি এই হাদিস দিয়ে শুরু করেছিলেন,

إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِىءٍ مَا نَوَى

"প্রত্যেক কাজ নিয়তের সাথে সম্পর্কিত। আর মানুষ তার নিয়ত অনুযায়ী ফল পাবে।"[৯]

[৯] সহীহ বুখারি, হাদিস নং : ১

সিরিয়ার জন্যে

আমাদের মতো দুর্বল ঈমানের মুসলিমদের জন্য দু‘আ হচ্ছে সবচেয়ে সহজ কাজের মধ্যে একটি। আমাদের দু‘আর মধ্যে কোনো আবেগ থাকে না। আকুতি থাকে না। সেখানে থাকে শুধু ঠোঁট নাড়ানো। আমরা নিজেরাও বুঝতে পারি না আমরা কী বলছি! আবার কখনো কখনো দু‘আকে আমরা আমাদের অলসতার ছুতো হিসেবে ব্যবহার করি।

➥ কোনো কঠিন কাজ করার মতো ঈমান না থাকলে আমরা বলি :

❊ পরিস্থিতির কারণে আমার পক্ষে কিছু করা সম্ভব হচ্ছে না। তবে দু‘আ করে দিচ্ছি।

❊ দু‘আ ছাড়া আমার পক্ষে কিছু করা সম্ভব না।

এখানে মোটেও দু‘আর গুরুত্বকে খাটো করা হচ্ছে না; বরং দু‘আর ক্ষেত্রে আমরা আসলেই আন্তরিক কি না সে প্রশ্ন করা হচ্ছে। নিঃসন্দেহে আমরা চেষ্টা চালিয়ে যাব, আর সাথে সাথে দু‘আর মাধ্যমে আল্লাহ তা‘আলার সাহায্য চাইব।

ইমাম ইবনুল কায়্যিম ﵀ বলেছেন,

> “দু‘আ আর আল্লাহর কাছে আশ্রয় চেয়ে সালাত আদায় করা হচ্ছে অস্ত্রের মতো। যে অস্ত্র চালাচ্ছে সে যদি দক্ষ হয়, তবে অস্ত্র এমনিতেই ভালো চলবে। শুধু অস্ত্র ধারলো হলেই চলবে না। যদি অস্ত্র নিখুঁত হয়, ত্রুটিমুক্ত হয় আর যে অস্ত্র চালাচ্ছে সেও শক্তিশালী হয়, তবেই কেউ তাকে থামাতে পারবে না। সে

শত্রুর অনেক ক্ষতি করতে পারবে।”[১০]

এ কারণে সীরাতের পাতায় পাতায় আমরা দেখতে পাই, জীবনের যেকোনো সংকটময় মুহূর্তে রাসূল ﷺ আল্লাহর কাছে দু‘আ করেছেন। কাতর হয়ে তাঁর কাছে সাহায্য চেয়েছেন।

বদরের যুদ্ধে রাসূল ﷺ আকুল হয়ে আল্লাহ তা‘আলাকে ডেকেছেন। তিনি তাঁর হাত উঁচু করে এমনভাবে দু‘আ করেছিলেন যে তাঁর চাদর মাটিতে পড়ে গিয়েছিল। বলেছিলেন,

اللّٰهُمَّ أنجز لي ما وعدتني، اللّٰهُمَّ آت ما وعدتني، اللّٰهُمَّ إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام لا تعبد في الأرض

“হে আল্লাহ, যে ওয়াদা তুমি আমায় দিয়েছিলে তা পূরণ করো। হে আল্লাহ, আমাকে যা দেয়ার ওয়াদা তুমি করেছিলে তা আমাকে দাও। আল্লাহ গো, আজ তুমি যদি এই মুসলিম দলকে মরতে দাও, তবে এই পৃথিবীতে কেউ আর তোমার ইবাদত করবে না।”[১১]

উহুদের যুদ্ধ ছিল মুমিনদের জন্য বিশাল একটি পরীক্ষা। সে যুদ্ধে রাসূল ﷺ তাঁর সাহাবিদের দু‘আর জন্য সারিবদ্ধ করেছিলেন। তারপর আল্লাহর নিকট দু‘আ করেছিলেন,

اللّٰهُمَّ ابسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك ، اللّٰهُمَّ إني أسألك النعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول

“হে আল্লাহ, তোমার ভান্ডার থেকে আমাদের বরকত, রহমত, প্রাচুর্য আর রিযিক দাও। হে আল্লাহ, আমি তোমার কাছে এমন স্থায়ী সুখ চাই যা কখনো চলে যায় না। কমেও যায় না।”[১২]

আর এখন যে দু‘আটি উল্লেখ করব তা নিয়ে খুব ভালোভাবে চিন্তা করুন। আমাদের সময়ে দু‘আটি খুবই প্রাসঙ্গিক। আহযাবের যুদ্ধে মুশরিকরা চারদিক

[১০] আল-জাওয়াবুল কাফি : ১/১৫
[১১] সহীহ মুসলিম, হাদিস নং : ১৭৬৩
[১২] মুসনাদে আহমাদ, হাদিস নং : ১৫৪৯২

থেকে মদিনাকে ঘিরে ফেলেছিল। আমাদের সময়ে সিরিয়ার আলেপ্পো, ইদলিব, গৌতায় যেমনটা হয়েছে, ঠিক তেমনই। আজ যেমন সিরিয়াতে আমাদের মুসলিম ভাইরা প্রাণের ভয়ে রাত কাটাচ্ছেন, সাহাবিদের জীবনেও এমন সময় এসেছিল। সাহাবিরাও নিজেদের সন্তানের জীবনের কথা ভেবে, স্ত্রীদের ইজ্জতের কথা ভেবে পেরেশান হয়ে যাচ্ছিলেন। রাসূল ﷺ তখন সাহাবিদের একটি দু'আ শিখিয়ে দিয়েছিলেন,

اللَّهُمَّ اسْتُرْ عَوَرَاتِنَا ، وَآمِنْ رَوَعَاتِنَا

"হে আল্লাহ, আমাদের দুর্বলতা ঢেকে দাও। আমাদের ভয়ে আশ্বাস দাও।"[১৩]

তিনি আরও দু'আ করেছেন,

اللّٰهُمَّ مُنزل الكتاب ، سريع الحساب ، اهزم الأحزاب ، اهزمهم وزلزلهم

"হে আল্লাহ, তুমি কিতাব প্রেরণকারী। দ্রুত হিসাবগ্রহণকারী। এ বাহিনীকে তুমি পরাজিত করে দাও। কাঁপিয়ে দাও ওদের ভিত।"[১৪]

খায়বারের যুদ্ধে মুসলিমদের খাবার ফুরিয়ে যাচ্ছিল। খায়বার দুর্গে যাওয়ার সময় সাহাবিরা রাসূল ﷺ-কে খাবারের বিষয়ে জানালে তিনি আল্লাহর কাছে হাত তুলে বলেছিলেন,

اللَّهُمَّ إِنَّكَ قَدْ عَرَفْتَ حَالَهُمْ وَأَنْ لَيْسَتْ بِهِمْ قُوَّةٌ وَأَنْ لَيْسَ بِيَدِي شَيْءٌ أُعْطِيهِمْ إِيَّاهُ ، فَافْتَحْ عَلَيْهِمْ أَعْظَمَ حُصُونِهَا ؛ أَكْثَرَهَا طَعَامًا وَوَدَكًا

"হে আল্লাহ, তুমি এদের অবস্থা সম্পর্কে জানো। আর এটাও জানো, তাদের কোনো শক্তি নেই, আমার তাদেরকে দেয়ার মতোও কিছু নেই। তাই তাদের জন্য সে দুর্গটা জয় করে দাও যেখানে সবচেয়ে বেশি খাবার রয়েছে।"[১৫]

আর মক্কা জয়ের সময়েও রাসূল ﷺ দু'আর কথা ভুলে যাননি। মুশরিকরা হুদাইবিয়া সন্ধি ভাঙার পর রাসূল ﷺ যখন মক্কা জয়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন,

[১৩] মুসনাদে আহমাদ, হাদিস নং : ১০৯৯৬
[১৪] ইবনে আবি শাইবা, হাদিস নং : ২৯৫৮৬
[১৫] তারিখে তাবারি : ৩/১০

তখন এই বলে তিনি আল্লাহর নিকট দু‘আ করেছিলেন,

اللّٰهُمَّ خذ العيون والأخبار عن قريش حتى نبغتها في بلادها

“হে আল্লাহ, সব গুপ্তচর ও খবরাখবর তুমি কুরাইশদের থেকে দূরে রাখো। যাতে আমরা তাদেরকে তাদের এলাকাতেই চমকে দিতে পারি।”[১৬]

তাই শুধু ঠোঁট নেড়ে যেকোনো দু‘আ করেই দায়িত্ব শেষ হয়ে গেছে এমনটা ভাববেন না। সিরিয়ার জন্যে, এ পৃথিবীতে নির্যাতিত সকল মুসলিম ভাইবোনের জন্যে অন্তর থেকে দু‘আ করুন। ঠিক যেভাবে রাসূল ﷺ পরিস্থিতি অনুযায়ী দু‘আ করেছেন। আল্লাহর কাছে চান, তিনি যেন সিরিয়াতে আবার শান্তি কায়েম করে দেন। সেখানে যেন আয়লান কুর্দির মতো কোনো ছেলেকে ভিনদেশে পাড়ি জমাতে গিয়ে জীবন হারাতে না হয়।[১৭] ওমরান ডাকনিশের মতো কোনো ছেলের শৈশব যেন দুঃস্বপ্নে পরিণত না হয়।[১৮]

ইউসুফের মতো আর কোনো যুবককে যেন এক আঘাতে সব কাছের মানুষদের হারিয়ে বিশাল এ পৃথিবীতে একা হয়ে যেতে না হয়।[১৯] আমরা দেখতে চাই না, আমাদের কোনো বোন নিজের ইজ্জত হারানোর ভয়ে এ কাপুরুষ উম্মাহর প্রতি একরাশ অভিমান নিয়ে আত্মহত্যা করছে।[২০] ক্ষুধায় কাতর সন্তানদের মুখে খাবার তুলে দিতে পতিতাবৃত্তিকে বেছে নিচ্ছে।[২১] আমরা চাইব, আল্লাহ সুবহানু তা‘আলা যেন আমাদের বোনদের, বোনদের সন্তানদের জন্য উত্তম রিযিকের ব্যবস্থা করেন,

---

[১৬] তারিখে তাবারি : ৩/৪৭

[১৭] Aylan Kurdi’s story: How a small Syrian child came to be washed up on a beach in Turkey
https://www.independent.co.uk/news/world/europe/aylan-kurdi-s-story-how-a-small-syrian-child-came-to-be-washed-up-on-a-beach-in-turkey-10484588.html

[১৮] Omran Daqneesh, young face of Aleppo suffering, seen on Syrian TV
https://edition.cnn.com/2017/06/07/middleeast/omran-daqneesh-syrian-tv-interview/index.html

[১৯] ‘My entire family’s gone’: Syrian man says 25 relatives died in strike
https://edition.cnn.com/2017/04/05/middleeast/syrian-man-loses-family-in-attack/index.html

[২০] Tragic suicide note of Aleppo nurse who killed herself to avoid rape by Syrian army
http://metro.co.uk/2016/12/14/women-trapped-in-aleppo-committing-suicide-to-avoid-rape-say-syrian-rebels-6321828/

[২১] Women in Syria ‘forced to exchange sexual favours’ for UN aid
https://www.telegraph.co.uk/news/2018/02/27/women-syria-forced-exchange-sexual-favours-un-aid/

যেমনটা তিনি করেছিলেন খায়বারের যুদ্ধে।

আজ থেকেই, আপনার দু'আতে সিরিয়ার ভাই-বোনদের কথা উল্লেখ করুন। আল্লাহর কাছে চান, তিনি যেন জালিমদের ধ্বংস করেন। শান্তি প্রতিষ্ঠার নামে যারা আলেপ্পো, ইদলিব, গৌতার মতো শহরগুলো ধ্বংস করেছে, আল্লাহ যেন তাদের এমন শাস্তি দান করেন যা দেখে পৃথিবীর প্রত্যেক জালিমের বুক ভয়ে কেঁপে উঠবে।

আল্লাহ তা'আলা যেন আবার সিরিয়াতে সোনালি সূর্যকে উদিত করেন। ভালোবাসার বৃষ্টি দিয়ে রক্তভেজা সিরিয়াকে জীবিত করেন।

মন ভালো নেই

'The Golden Gate Bridge' এর নাম শুনেছেন? ব্রিজটি আমেরিকার স্যান ফ্রান্সিসকোতে অবস্থিত। সুইসাইডের জন্য খুবই বিখ্যাত। প্রায় প্রতি সপ্তাহেই এখানে গড়ে একজন মানুষ আত্মহত্যা করে।[২২]

আমেরিকা! কত মানুষের স্বপ্নের আমেরিকা। সেখানের বাতাস নিতে পারলে নাকি জীবনে আর কোনো দুঃখ-কষ্ট থাকে না। অথচ *'American Foundation for Suicide Prevention'*-এর দেয়া তথ্যমতে, আমেরিকায় প্রতিদিন প্রায় ১২৩ জন মানুষ সুইসাইড করে।[২৩]

বর্তমান বিশ্বের সুপার পাওয়ার আমেরিকা। সারা বিশ্বে তারা শান্তির ফেরি করে বেড়ায়। প্রযুক্তি, শিক্ষা, সম্পদ— সবই নাকি তার আছে। তারপরেও কী যেন নেই!

➥ **ইমাম ইবনুল কায়্যিম রাহিমাহুল্লাহ বলতেন,**

❋ "প্রত্যেক মানুষের অন্তরেই রয়েছে অস্থিরতা, যা কেবল আল্লাহর কাছে ফিরে গেলেই ঠিক করা সম্ভব।

❋ প্রত্যেক মানুষের অন্তরে এক শূন্যতা রয়েছে, সেটা কেবল আল্লাহর কাছে ফিরে গেলেই দূর করা সম্ভব।

---

[২২] People Committed Suicide At Golden Gate Bridge Nearly Once A Week Last Year
https://www.huffingtonpost.com/2014/02/25/golden-gate-bridge-suicide_n_4855880.html

[২৩] Suicide Statistics
https://afsp.org/about-suicide/suicide-statistics/

❈ প্রত্যেক মানুষের অন্তরে রয়েছে ভয় আর উৎকণ্ঠা, যা কেবল আল্লাহর কাছে আশ্রয় নিলেই দূর করা সম্ভব।

❈ আর প্রত্যেক মানুষের অন্তরেই রয়েছে হতাশা, যেটা কেবল আল্লাহর ওপরে সন্তুষ্ট হলেই দূর করা সম্ভব।"[২৪]

এই বস্তুবাদী দুনিয়া আমাদের শেখায় আমরা যত বেশি ভোগ করতে পারব, তত বেশি সুখী হব। তাই ভোগের জন্য ছুটতে থাকো। সারা জীবন সম্পদের পাহাড় করেও তাই একদিন মনে হয় কী যেন নেই! এক অপূর্ণতা রয়ে গেছে। এ অপূর্ণতা আল্লাহর কাছ থেকে দূরে থাকার। আল্লাহকে বাদ দিয়ে এই ক্ষণস্থায়ী দুনিয়ার পূজা করার।

এই অপূর্ণতা কোনো কিছু দিয়েই পূরণ হবে না। সুন্দরী স্ত্রী দিয়ে না। ডুপ্লেক্স বাড়ি দিয়ে না। আইফোন, রোলেক্স, মার্সিডিজ—সবকিছুই ক্ষণস্থায়ী আনন্দ দেবে। অনেকটা ড্রাগের মতো। তারপরে হৃদয়ের কোনো এক কোণে জমে থাকা শূন্যতাটা আবার মাথাচাড়া দিয়ে উঠবে। মাঝরাতে ঘুম ভেঙে গেলে নিজেকে খুব একা একা লাগবে। এ জীবনটা অর্থহীন মনে হবে।

তাই ফিরতে হবে আল্লাহর কাছে। আচ্ছা! তাঁর কাছে ফিরলেই কি আবার জীবনটা রূপকথার মতো সুখী হয়ে যাবে? মোটেও না। দুঃখ-কষ্ট তো আসবেই। আসবে কঠিন কিছু পরীক্ষা। কিন্তু কোথা থেকে যেন দানবীয় শক্তি আসবে সেই কষ্টগুলোর মুখোমুখি হবার। তপ্ত মরুভূমিতে সূর্যের দিকে তাকিয়ে "আহাদুন আহাদ" বলার।

যেমনটা রাসূল ﷺ বলেছেন,

عَجَبًا لِأَمْرِ الْمُؤْمِنِ، إِنَّ أَمْرَهُ كُلَّهُ خَيْرٌ، وَلَيْسَ ذَاكَ لِأَحَدٍ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ، إِنْ أَصَابَتْهُ سَرَّاءُ شَكَرَ، فَكَانَ خَيْرًا لَهُ، وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ، صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ

"মুমিনের ব্যাপারটা খুবই আশ্চর্যজনক। যখন তার সাথে ভালো কিছু ঘটে, তখন সে কৃতজ্ঞ হয় আর এটাই তার জন্য উত্তম। আর যখন তার কোনো ক্ষতি হয়, তখন সে সবর করে আর এটাও তার জন্য উত্তম।"[২৫]

---

[২৪] মাদারিজুস সালেকিন : ৩/১৫৬

[২৫] সহীহ মুসলিম, হাদিস নং : ২৯৯৯

তাই হুজুর হয়ে গেলেই যে, আর মন খারাপ হবে না, বিষণ্ণ লাগবে না; ব্যাপারটা কখনোই এমন না। তবে আল্লাহর ওপর ভরসা করে একজন মুমিন সে কষ্টগুলোর মুখোমুখি হতে পারে। শায়খ মুহাম্মাদ ইবনে সালিহ ইবনে উসাইমিন ﵀-কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, "একজন মুমিন কি মানসিক অস্থিরতায় ভুগতে পারে?" উনি জবাবে বলেছিলেন,

"অবশ্যই সে বিভিন্ন মানসিক অস্থিরতায় ভুগতে পারে। সে ভবিষ্যৎ নিয়ে উদ্বিগ্ন হতে পারে। অতীতের ব্যাপারে তার মনে আফসোস সৃষ্টি হতে পারে।"[২৬]

হুট করেই আমাদের মন খারাপ হয়ে যায়। খুব বিষণ্ণ লাগে। এ বিশাল পৃথিবীতে নিজেকে খুব একা একা লাগে। তবে সে একা সময়েও রাসূল ﷺ-এর একটি নসীহা আমাদের সাথে আছে। তিনি আমাদের বিষণ্ণতা দূর করার জন্য একটি ওষুধের কথা বলে গেছেন।

রাসূল ﷺ বলেছেন, "যদি কেউ বিষণ্ণ হওয়ার পর বলে,

اللَّهُمَّ إِنِّي عَبْدُكَ ابْنُ عَبْدِكَ ابْنُ أَمَتِكَ، نَاصِيَتِي بِيَدِكَ، مَاضٍ فِيَّ حُكْمُكَ، عَدْلٌ فِيَّ قَضَاؤُكَ، أَسْأَلُكَ بِكُلِّ اسْمٍ هُوَ لَكَ، سَمَّيْتَ بِهِ نَفْسَكَ، أَوْ أَنْزَلْتَهُ فِي كِتَابِكَ، أَوْ عَلَّمْتَهُ أَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ، أَوِ اسْتَأْثَرْتَ بِهِ فِي عِلْمِ الْغَيْبِ عِنْدَكَ، أَنْ تَجْعَلَ الْقُرْآنَ رَبِيعَ قَلْبِي، وَنُورَ صَدْرِي، وَجَلَاءَ حُزْنِي، وَذَهَابَ هَمِّي

'আল্লাহ গো, আমি তো তোমারই দাস। তোমার দাসের পুত্র আমি। আমি পুত্র তোমারই এক দাসীর। আমার কপাল তোমার হাতে। আমার ওপর তোমার নির্দেশ অবশ্যই কার্যকর হবে। আর আমার ব্যাপারে তুমি যে ফয়সালাই দাও না কেন, সেটাই সঠিক। আমি তোমার কাছে চাচ্ছি, তোমার প্রতিটা নামের উসীলায়। যে নাম তুমি নিজের জন্য রেখেছ। কোনো কিতাবে নাযিল করেছ। কাউকে শিখিয়েছ অথবা নিজের জন্যেই রেখে দিয়েছ। (আল্লাহ গো,) তুমি কুরআনকে বানিয়ে দাও আমার হৃদয়ের প্রশান্তি। আমার বক্ষের জ্যোতি। দুঃখের অপসারণকারী। আমার দুঃশ্চিন্তা দূরকারী।'

তবে আল্লাহ তার বিষণ্ণতা ও দুঃখ দূর করে দেবেন আর (অন্তরটা) আনন্দ দিয়ে

---

[২৬] ফতওয়া ইসলামিয়া : ৪/৪৬৫

পূর্ণ করে দেবেন।” সাহাবিরা জিজ্ঞেস করলেন,

> “হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের কি এই কথাগুলো শেখা উচিত না?” রাসূল ﷺ বললেন, “হাঁ, অবশ্যই। যে কেউ এই কথাগুলো শুনবে, তার এটি শেখা উচিত।”[২৭]

সংশয়বাদীরা হয়তো এই হাদিসটি শুনে ভ্রু কুঁচকে বলবে, “তাহলে মানুষ এত এত টাকা খরচ করে চিকিৎসা করায় কেন? এই দু‘আটি পড়লেই তো পারে।” তবে আমরা তো আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের ওপর ঈমান এনেছি। আমাদের জন্য তাঁর কথাই যথেষ্ট। আর যারা সত্যিই মন দিয়ে বুঝে বুঝে এই দু’আ পড়েছে, তারা অবশ্যই এই দু’আর উপকারিতার কথা স্বীকার করবেন।

শায়খ মুহাম্মাদ ইবনে সালিহ ইবনে উসাইমিন رحمه الله বলেছেন,

> “মানুষের ঈমান আজ দুর্বল হয়ে গেছে। আজ তারা শরিয়াহতে যে আরোগ্যের কথা বলা হয়েছে, তা গ্রহণ করতে আগ্রহী নয়। শরিয়াহতে যে আরোগ্যের কথা বলা হয়েছে তার চেয়ে তারা ওষুধের ওপরেই বেশি ভরসা করে। কিন্তু যখন কারও ঈমান দৃঢ় থাকে, শরিয়াহর এই আরোগ্যগুলো সম্পূর্ণ কার্যকর হয়। এমনকি ওষুধের চেয়েও এটি ভালো কাজ করে।”[২৮]

বর্তমান পৃথিবীতে প্রতি ৪০ সেকেন্ডে একজন মানুষ সুইসাইড করে।[২৯] এদের মধ্যে অনেকেই সমাজের এলিট ক্লাসের লোক। সব থেকেও কী যেন নেই তাদের। আমি আমার অতি ক্ষুদ্র জীবনে কখনো কোনো ঈমানদার মানুষকে সুইসাইড করতে দেখিনি। সুইসাইড করার কথা শুনিওনি। কারণ, তারা আল্লাহর ওপর ভরসা করে। তাই তখন আর কষ্ট এলে সুইসাইড করতে ইচ্ছা করবে না। মনে হয় এই জীবন আর কদিনের? একদিন ক্লান্তি শেষে বিশ্রাম নেব।

আমরা আল্লাহর কাছে চাই যেন উনি সে দিনটা আমাদের দুই জীবনের শ্রেষ্ঠ দিন বানিয়ে দেন যেদিন আমরা তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করব। জান্নাতে তাঁর দেখা পাব।

---

[২৭] ইবনে আবি শাইবা, হাদিস নং : ৩২৯

[২৮] ফতওয়া ইসলামিয়া : ৪/৪৬৫

[২৯] Suicide data
http://www.who.int/mental_health/prevention/suicide/suicideprevent/en/

ঝুম বৃষ্টিতে

বৃষ্টি হচ্ছে। ঝুম বৃষ্টি।

➥ হুট করে প্রচণ্ড বৃষ্টি শুরু হলে অধিকাংশ মানুষ কী করে? দৌড়ে বৃষ্টির হাত থেকে বাঁচার চেষ্টা করে। মুখে ফুটে ওঠে বিরক্তির ছাপ :

- ➢ "উফ! বৃষ্টি হচ্ছে।"
- ➢ "বৃষ্টি আসার আর সময় পেল না?"
- ➢ "ধ্যাৎ! মরার বৃষ্টির জন্য দিনটাই মাটি।"

কোনোরকমে গা বাঁচিয়ে বাসায় গিয়ে হাই ভলিউমে গান শুনে বাঙালিরা বৃষ্টিবিলাস করে। একটু শৌখিন হলে হয়তো ভুনা খিচুড়ি খেয়ে ঝাড়া ঘুম।

আচ্ছা! বৃষ্টি এলে রাসূল ﷺ কী করতেন? তিনি কিন্তু মোটেও পালিয়ে যেতেন না; বরং প্রচণ্ড খুশি হতেন। খুব সাবধানতার সাথে তিনি তাঁর পবিত্র দেহের কিছু অংশ উন্মুক্ত করে বৃষ্টির পরশ বোলাতেন।

আনাস رضي الله عنه বলেন, "আমরা যখন রাসূল ﷺ-এর সাথে ছিলাম, তখন বৃষ্টি এল। তিনি শরীরের কিছু অংশ উন্মুক্ত করে বৃষ্টিকে অনুভব করলেন। আমরা বললাম, "হে রাসূলাল্লাহ, আপনি এমন কেন করলেন?" তিনি বললেন,

لِأَنَّهُ حَدِيثُ عَهْدٍ بِرَبِّهِ تَعَالَى

"এটা (এই বৃষ্টি) এক্ষুনি আমার রবের পক্ষ থেকে এসেছে।"[৩০]

ইমাম নববী ﷬ এ হাদিসের ব্যাপারে বলেন,

"এই হাদিসটি তাদের জন্য দলিল যারা বলে, বৃষ্টির শুরুতে নিজের সতর ছাড়া শরীরের অন্য কোনো অংশ উন্মুক্ত করতে বলা হয়েছে। যাতে করে শরীরে বৃষ্টির পরশ বোলানো যায়।"[৩১]

ইমাম কুরতুবী ﷬ এই হাদিস সম্পর্কে মন্তব্য করেন,

"আমাদের নবি ﷺ বৃষ্টির বারাকাহ পেতে এমনটা করতেন। এর দ্বারা আরোগ্য লাভ করতেন। কারণ, আল্লাহ তা'আলা বৃষ্টিকে রহমত, মনোরম এবং সংশোধক বলে বর্ণনা করেছেন। এটি জীবন আনয়নকারী। আযাব দূরকারী। এই হাদিস আমাদের আরও শেখায় যে, প্রত্যেকেরই এই বর্ষণকে সম্মান করা উচিত এবং এর সম্পর্কে বিরূপ মন্তব্য করা থেকে বিরত থাকা উচিত।"[৩২]

সাহাবিরা এই সুন্নাহ অনুসরণে খুবই আগ্রহী ছিলেন। উসমান ﷛ বৃষ্টির শুরুতে নিজেকে উন্মুক্ত করতেন। আব্বাস ﷛-ও একই কাজ করতেন। আলী ﷛ বৃষ্টির মধ্যে বসে থাকতেন আর বলতেন,

حَدِيثُ عَهْدٍ بِالْعَرْشِ

"এটা অবশ্যই আরশের (অধিপতির নির্দেশে) এই মাত্রই এসেছে।"[৩৩]

রাসূল ﷺ বৃষ্টি শুরু হলে দু'আ করতেন,

اللَّهُمَّ صَيِّبًا نَافِعًا

"হে আল্লাহ, মুষলধারায় উপকারী বৃষ্টি বর্ষণ করুন।"[৩৪]

---

[৩০] সহীহ মুসলিম, হাদিস নং : ৮৯৮
[৩১] শরহু মুসলিম : ৬/১৯৬
[৩২] আল-মুফহিম : ২/৫৪৬
[৩৩] ইবনে আবি শাইবা, হাদিস নং : ২৬১৭৮
[৩৪] সহীহ বুখারি, হাদিস নং : ১০৩২

রাসূল ﷺ আরও বলেন,

“এই দুইটি (দু‘আ) প্রত্যাখ্যান করা হয় না। আযানের সময়ে দু‘আ আর বৃষ্টির সময়ে দু‘আ।”[৩৫]

খুব সমস্যা না হলে পরের বার বৃষ্টি শুরু হলে চেষ্টা করুন না দৌড়াতে। না পালাতে। ছাতাটা বন্ধ করুন। চলার পথে একটুখানি থমকে দাঁড়ান। শরীরের কিছু অংশ উন্মুক্ত করুন। আর দেহটাকে বৃষ্টির সংস্পর্শে আসতে দিন। অনুভব করতে দিন আকাশ থেকে আসা মহান আল্লাহ্ তা‘আলার রহমতকে।

রাসূল ﷺ-এর সুন্নাহকে আবার জীবিত করুন।

[৩৫] সুনানে আবু দাউদ, হাদিস নং : ২৫৪০; এ হাদিসগুলো প্রথম বৃষ্টির সাথে সম্পৃক্ত।- শার‘ঈ সম্পাদক

নিশিতে দুজনে

একবিংশ শতাব্দীকে বলা হয় বিজ্ঞানের যুগ। তথ্য-প্রযুক্তির যুগ। বিজ্ঞান আজ পুরো পৃথিবীকে আমাদের কাছে নিয়ে এসেছে। আর একই সাথে কেন যেন আমাদের কাছের মানুষদের নিয়ে গিয়েছে অনেক দূরে। সারাদিনের কাজ শেষে আমরা ফেইসবুক নিয়ে বসি। রিলাক্স মুডে টিভি দেখি। স্ত্রীকে দেয়ার মতো সময় কোথায়?

রাসূল ﷺ ছিলেন মুসলিমদের নেতা। তিনি মসজিদে ইমামতি করতেন। লোকজন প্রশ্ন করলে তার উত্তর দিতেন। নিজের কাজ নিজেই করতেন। নিজেই ঠিক করতেন নিজের জুতো। নিজের কাপড় নিজেই সেলাই করতেন, নিজেই নিজের কাপড় ধুতেন। যুদ্ধের সময় সবাইকে দিতেন প্রয়োজনীয় দিক-নির্দেশনা। তারপর ব্যস্ত দিন শেষে রাতের একটি বড় অংশ আল্লাহ তা'আলার ইবাদত করতেন। এত কিছুর পরেও তিনি স্ত্রীকে সময় দিতে ভুলতেন না—

وَكَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِذَا كَانَ بِاللَّيْلِ سَارَ مَعَ عَائِشَةَ يَتَحَدَّثُ

"রাসূল ﷺ রাতের বেলায় আয়েশা ﵂-এর সাথে হাঁটতেন। দুজন গল্প করতেন।"[৩৬]

যেসব বিবাহিত ব্যক্তিরা প্রায়ই এ কাজটি করেন, তারা অবশ্যই জানেন, রাতের বেলা এভাবে একসাথে হাঁটার অভিজ্ঞতাটা যেন জীবনটাকেই বদলে দেয়। সম্পর্কটা

---

[৩৬] সহীহ বুখারি, হাদিস নং : ৫২১১

আরও মধুর করে তোলে। দাম্পত্যজীবনে এনে দেয় নতুন এক মাত্রা। বিয়ে মানেই রূপকথার জীবন নয়। এখানে যেমন মিষ্টি মিষ্টি কথা আছে, রোমান্স আছে; তেমনি আছে রাগ-অভিমান, কান্না। যদি দাম্পত্যজীবনে সৃষ্ট এই ভুল বোঝাবুঝিকে দ্রুতই ঠিক না করা হয়, তবে দাঁত যেমন ধীরে ধীরে ক্ষয়ে যায়, সম্পর্কগুলোও আস্তে আস্তে নষ্ট হয়ে যায়।

বহু মানুষই বৈবাহিক জীবনের তিক্ততায় জর্জরিত। সারাক্ষণ তারা শুধু এটা নিয়েই ভাবেন। নিজের জীবনটাকে গুছিয়ে আখিরাত নিয়ে ভাবার সময় তাদের হয়ে ওঠে না। এমতাবস্থায়, এই সুন্নাহগুলোই পারে সামান্য ভুলের জন্য ভেঙে পড়া সম্পর্কগুলোকে নতুন করে গড়তে।

ক্লান্ত দিন শেষে একদিন রাতের বেলা চেষ্টা করেই দেখুন না। টিভিটা বন্ধ করুন, মোবাইলটাও না হয় বাসাতেই রাখুন। প্রিয়তমাকে নিয়ে একটু হাঁটতে বের হোন। তার চোখে চোখ রেখে ভালোবাসার কথা বলুন। হাতে হাত রেখে হারিয়ে যান দূরে কোথাও।

দেখবেন আল্লাহ তা'আলাই স্বয়ং আপনাদের মধ্যে ভালোবাসা সৃষ্টি করে দেবেন। জীবনটাকে রাঙিয়ে দেবেন এক অপার্থিব আনন্দে।

সবখানেই তাঁর নিদর্শন দেখা

একটা দৃশ্যের কথা কল্পনা করুন তো!

একটি দালানের ভেতর বিভিন্ন পেশার লোকজন হেঁটে যাচ্ছে। এদের মধ্যে কেউ ইঞ্জিনিয়ার, কেউ আর্কিটেক্ট কেউবা ইলেক্ট্রিশিয়ান। স্বাভাবিকভাবেই কী হবে?

➡ প্রত্যেক পেশার লোকজনই দালানের সে অংশ খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখবে, যে অংশে তার কর্মক্ষেত্রের প্রয়োগ রয়েছে।

❋ একজন কাঠমিস্ত্রি মন দিয়ে দালানের দরজা আর জানালাগুলো দেখবেন।

❋ যিনি আর্কিটেক্ট তিনি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দালানের নকশা আর কারুকার্য দেখবেন।

❋ ইলেক্ট্রিশিয়ান গভীর মনোযোগ দিয়ে দালানের আলোকসজ্জা আর বিদ্যুৎ-সংযোগ নিয়ে ভাববেন।

❋ আর যিনি সিভিল ইঞ্জিনিয়ার তিনি বিল্ডিঙের পিলারগুলো নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা করবেন।

একই অবস্থা হয় প্রতিটি তাকওয়াবান মুসলিমের। এ দুনিয়ার সবকিছুতেই সে তার রবের নিদর্শন খুঁজে পায়।

যখন সে কোনো ভয় পাওয়া শব্দ শোনে, তখন তার স্মরণে আসে কিয়ামতের

কথা। সে সময়ের কথা যখন শিঙায় শেষ ফুঁ দেয়া হবে। যখন সে অন্ধকারের মুখোমুখি হয়, তখন তার কবরের অন্ধকার জীবনের কথা মনে পড়ে যায়। আবার তীব্র গরমের সময়ে তার মনে পড়ে যায় জাহান্নামের আগুনের ভয়াবহতা। সে চিন্তা করে, "এই গরম সইতে পারি না, জাহান্নামের আগুন কেমন করে সইব?"

রাসূল ﷺ সবচেয়ে বেশি আল্লাহ তা'আলাকে ভয় করতেন। সব সময় তাঁর অন্তর মহান রবের স্মরণে ব্যস্ত থাকত। তিনি এত বেশি আল্লাহ্ তা'আলার কথা ভাবতেন যে, জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই দয়াময়ের নিদর্শন খুঁজে পেতেন। রাসূল ﷺ ছিলেন পুরো পৃথিবীর নেতা। সবার জন্য রোলমডেল। সাহাবারা তাঁকে পদে পদে অনুসরণ করতেন। ভালোবাসতেন। রাসূল ﷺ-এর সবখানে মহান আল্লাহ তা'আলার নিদর্শন দেখতে পারার গুণটি তাদের খুব নাড়া দিত।

রাসূল ﷺ একদিন সাহাবিদের নিয়ে বাজারের মধ্যে হাঁটছিলেন। তিনি একটা ছাগলের সামনে আসলেন। ছাগলটার কান ছিল খুবই ছোট। তিনি এটার কান ধরে বললেন, "তোমাদের মধ্যে কে এটাকে এক দিরহাম দিয়ে কিনবে?" তারা জবাব দিলেন, "আল্লাহর শপথ! আমরা তো এটাকে জীবিত থাকা অবস্থাতেই কিনতাম না। আর এখন তো এটা মৃত। আমরা এটা দিয়ে কী করব?"

উত্তর শুনে রাসূল ﷺ বললেন,

فَوَاللهِ لَلدُّنْيَا أَهْوَنُ عَلَى اللهِ مِنْ هَذَا عَلَيْكُم

"আল্লাহর কসম করে বলছি! তোমাদের চোখে এটা (ছাগলটা) যত তুচ্ছ, আল্লাহ্ তা'আলার কাছে এ দুনিয়া তার চেয়েও বেশি তুচ্ছ।"[৩৭]

অন্য কেউ হলে হয়তো নাকে হাত চেপে দ্রুত সেখান থেকে চলে যেত। কিন্তু রাসূল ﷺ এক মৃত ছাগলের মধ্যেও শিক্ষা খুঁজে পেয়েছিলেন। সে জ্ঞান তিনি সাহাবিদের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে পেরেছিলেন। তাদের এ দুনিয়াটা একটু অন্যভাবে দেখতে শিখিয়েছিলেন।

আরেকদিন রাসূল ﷺ লক্ষ করলেন এক মহিলা পাগলের মতো তার হারিয়ে যাওয়া শিশুকে খুঁজছে। অনেকক্ষণ পর সে বাচ্চাটিকে খুঁজে পেল। বুকে জড়িয়ে

[৩৭] সহীহ মুসলিম, হাদিস নং : ২৯৫৭

ধরে শিশুটাকে দুধ খাওয়াতে লাগল। একজন মা তার সন্তানকে পাগলের মত খুঁজবেন, শিশুর ক্ষুধা নিবারণের চেষ্টা করবেন, এটাই তো স্বাভাবিক। কিন্তু অতি সাধারণ এই ঘটনার মধ্যেও রাসূল ﷺ অসাধারণত্ব খুঁজে পেলেন। সাহাবিরাও এই দৃশ্য দেখছিলেন। তাই তিনি সাহাবিদের উদ্দেশে বললেন, "তোমরা কি মনে করো এই মহিলা কখনো তার বাচ্চাকে আগুনের মধ্যে ছুড়ে ফেলতে পারবে?" সাহাবিরা জবাব দিলেন, "আল্লাহর কসম! কখনোই সে এটা করবে না।" রাসূল ﷺ তখন বললেন,

اللَّــهُ أَرْحَمُ بِعِبَادِهِ مِنْ هَذِهِ بِوَلَدِهَا

"এই মহিলা তার সন্তানের প্রতি যতটুকু মমতাময়ী, আল্লাহ তাঁর বান্দার প্রতি এর চেয়েও বেশি দয়াময়।"[৩৮]

আমাদের সালাফদের চিন্তা-ভাবনাও রাসূল ﷺ-এর মতো ছিল। কোনো একদিন প্রচুর বৃষ্টি হচ্ছিল। মেঘের গর্জনে কান পাতাই দায়! এ অবস্থায় সবাই অবাক হয়ে দেখল উমার বিন আব্দুল আযীয রহিমাহুল্লাহ হাসছেন। এমন বৈরী আবহাওয়া দেখেও লোকেরা তাঁকে হাসার কারণ জিজ্ঞেস করলে উনি বললেন,

هذا صوت رحمة الله، فكيف لو سمعت صوت عذاب الله؟

"এটা তো আল্লাহ তা'আলার রহমতের শব্দ (অর্থাৎ বৃষ্টি)। যখন আল্লাহ তা'আলার আযাবের শব্দ শুনবে তখন তোমাদের অবস্থা কেমন হবে?"[৩৯]

জীবনের প্রতিটা ক্ষেত্রে এভাবে আল্লাহ তা'আলার নিদর্শন দেখতে পারাটা জানিয়ে দেয়, একজন মানুষের অন্তর কতটা নূরের আলোয় আলোকিত! মহান আল্লাহ তা'আলাকে স্মরণ করতে তার ইউটিউব ভিডিও দেখার প্রয়োজন নেই।

---

[৩৮] সহীহ মুসলিম, হাদিস নং : ২৭৫৪

ইমাম ইবনে তাইমিয়া রহিমাহুল্লাহ বলেন,

فَبَيَّنَ أَنَّ اللَّــهَ أَرْحَمُ بِعِبَادِهِ مِنْ أَرْحَمِ الْوَالِدَاتِ بِوَلَدِهَا فَإِنَّهُ مَنْ جَعَلَهَا رَحِيمَةً أَرْحَمُ مِنْهَا

"সবচেয়ে মমতাময়ী মায়ের চেয়েও আল্লাহ তা'আলা তাঁর বান্দার প্রতি বেশি দয়াময়। যিনি সেই মাকে মমতাময়ী বানিয়েছেন, তাঁর দয়া তো সেই মায়ের চেয়ে বেশি হবেই।" (মাজমু ফতওয়া : ১৬/৪৪৮)

[৩৯] তারিখে দিমাশক ইবনে আসাকির : ৪৫/১৫৩

ঘণ্টায় ঘণ্টায় ফেইসবুক স্ট্যাটাস পড়ার মুখাপেক্ষীও সে নয়। বরং জীবনে ঘটা প্রতিটা ঘটনা থেকে সে তার রবকে খুঁজে নেয়। মানুষকে তার স্রষ্টার অপার মহিমার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। যেমনটা রাসূল ﷺ করতেন।

কতই-না ভালো হতো যদি আমরা সবাই তাঁদের মতো করে চিন্তা করতে পারতাম!

হালাল খাবারের দোষ না ধরা

➤ "ইয়াক থু! এগুলো মানুষ খায়?"

➤ "উফ! কী বিশ্রী!"

➤ "কোন ডাস্টবিন থেকে এটা নিয়ে আসছো?"

এই কথাগুলো আমরা প্রায়ই ডাইনিং টেবিলে শুনে থাকি। হয়তো নিজেরাও বলে ফেলি। আল্লাহ তা'আলা আমাদের ক্ষমা করুন। আবু হুরাইরা ﵁ থেকে আমরা একটি হাদিস পাই, যা আমাদের এই বদ অভ্যাস ত্যাগ করতে বলে। তিনি বলেন,

مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّـهِ صلى الله عليه وسلم عَابَ طَعَامًا قَطُّ كَانَ إِذَا اشْتَهَاهُ أَكَلَهُ وَإِنْ لَمْ يَشْتَهِهِ سَكَتَ

"আমি রাসূল ﷺ-কে কখনো খাবারের দোষ ধরতে দেখিনি। তিনি ইচ্ছা হলে কোনো খাবার খেতেন। আর মন না চাইলে চুপ থাকতেন।"[৪০]

একদিন রাসূল ﷺ এবং খালিদ ﵁ উম্মুল মুমিনীন মায়মুনা ﵂-এর ঘরে প্রবেশ করলেন। তাদের ভুনা দ্বব্বের[৪১] মাংস খেতে দেয়া হলো। রাসূল ﷺ সেখান থেকে খাওয়ার জন্য হাত বাড়ালে কিছু মহিলা বলল, "রাসূল ﷺ-কে কী খাওয়াচ্ছ তা আগে তাঁকে জানাও।" তারা বলল, "হে আল্লাহর রাসূল, এটা হচ্ছে দ্বব্ব।" এ কথা শুনে রাসূল ﷺ তাঁর হাত গুটিয়ে নিলেন।

[৪০] সহীহ মুসলিম, হাদিস নং : ২০৬৪

[৪১] الضب (দ্বব্ব)। আরবের এক প্রকার জীব। দেখতে গুইসাপের মতো। যদিও তা গুইসাপ নয়।

এটা দেখে খালিদ ﵁ বললেন, "হে আল্লাহর রাসূল, দ্বব্ব খাওয়া কি হারাম?" রাসূল ﷺ খুব ভদ্রভাবে খাবারের কোনো সমালোচনা না করে জবাব দিলেন,

لا ولكن لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه

"না। কিন্তু এটি আমাদের এলাকায় নেই। তাই আমি এটা খাওয়া পছন্দ করি না।"

রাসূল ﷺ-এর কাছে সবুজ সংকেত পেয়ে খালিদ ﵁ খাওয়া শুরু করলেন। তিনি বলেন,

"আমি সেটি টেনে নিয়ে খেতে থাকলাম। আর রাসূল ﷺ আমার দিকে তাকিয়ে থাকলেন।"[৪২]

➡ ইমাম নববী ﵀ বলেন, "নিঃসন্দেহে খাবারের একটি আদব হচ্ছে, এটির ব্যাপারে সমালোচনা না করা। এটা না বলা :

- ➢ বেশি লবণ হয়ে গেছে।
- ➢ টক হয়ে গেছে।
- ➢ লবণই তো হয়নি।
- ➢ পাতলা হয়ে গেছে।
- ➢ ঘন হয়ে গেছে।
- ➢ ভালোমতো রান্নাই হয়নি।"[৪৩]

আমাদের কাছে কিছু কিছু খাবার ভালো না-ই লাগতে পারে। তার মানে এই না সবার কাছেও সেটা খারাপ লাগবে। অনেকেই হয়তো খাবারটি খায়। খেতে পছন্দ করে। সকল হালাল খাবারই আল্লাহ তা'আলার নিয়ামত। আমাদের এ নিয়ামতের জন্য শুকরিয়া আদায় করা উচিত। অমার্জিত কথা বলার তো প্রশ্নই ওঠে না!

এই হাদিসটি আমাদের শেখায়, ভালো না লাগলে সে খাবার না খাওয়া দোষের কিছু না। আর এমনটা করলে তাতে লজ্জারও কিছু নেই।

মুখে কৃত্রিম হাসি লাগিয়ে মানুষকে খুশি করার জন্য খাবার খাওয়ার প্রয়োজন নেই।

---

[৪২] সহীহ মুসলিম, হাদিস নং : ১৯৪৫
[৪৩] শরহু মুসলিম : ১৪/২৬

গুনাহের পর দুই রাকাত সালাত

হয়তো হুট করেই নির্জনে আমরা কোনো গুনাহে লিপ্ত হয়ে যাব। সে গুনাহ আমাদের অজান্তেই সবার সামনে প্রকাশও করে ফেলব। নিজের গুনাহের ফল তো নিজেকেই বইতে হবে।

কিন্তু গুনাহের শাস্তি থেকে বাঁচার কি কোনো উপায়ই নেই?

হাঁ, আছে। ইবনে তাইমিয়া ﵀ অনেকগুলো উপায়ের কথা বলেছেন। তিনি বলেন,

➥ "যখন কোনো মুমিন গুনাহ করে, দশ উপায়ে উক্ত গুনাহের শাস্তি থেকে সে মুক্ত হতে পারে :

১) সে তওবা করে আর তওবা করার কারণে আল্লাহ তা'আলা তাকে মাফ করে দেন।[৪৪]

২) কিংবা সে আল্লাহর কাছে ক্ষমা চায়। তাই আল্লাহ তাকে ক্ষমা

---

[৪৪] আবু হুরাইরা ﵁ থেকে বর্ণিত, রাসূল ﷺ বলেছেন, "যদি তোমরা এমনভাবে গুনাহ করতে থাকো, যে তোমাদের গুনাহ আসমান ছুঁয়ে যায়, আর তারপর তওবা করো। (তবুও) তোমাদের তওবা কবুল করা হবে।" (ইবনে মাজাহ, হাদিস নং : ৪২৪৮)

করে দেন।[৪৫]

৩) সে ভালো ভালো কাজ করে। আর সে ভালো কাজগুলো প্রকৃতিগতভাবেই খারাপ আমলগুলোকে মিটিয়ে দেয়।[৪৬]

৪) ওই ব্যক্তি জীবিত কিংবা মৃত থাকা অবস্থায় কোনো মুমিন ভাই তাকে ক্ষমা করার জন্য আল্লাহর কাছে দু'আ করে।[৪৭]

৫) অথবা তাদের মধ্য থেকে কেউ তাকে উত্তম আমল উপহার দেয়।[৪৮]

৬) যখন রাসূল ﷺ কিয়ামতের দিন তার জন্যে শাফায়াত করবেন।[৪৯]

৭) যখন আল্লাহ তা'আলা তাকে দুনিয়ার জীবনে দুঃখ-কষ্ট দেন আর

---

[৪৫] আবু হুরাইরা رضي الله عنه থেকে বর্ণিত, রাসূল ﷺ বলেছেন, "আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'আমার এক বান্দা গুনাহ করে আর তারপর বলে, 'হে আল্লাহ, আমার গুনাহ মাফ করে দিন।' তারপর আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'আমার বান্দা গুনাহ করেছে আর এরপর বুঝতে পেরেছে, তার এক রব রয়েছেন যিনি গুনাহের জন্য ক্ষমা করতে পারেন, আবার শাস্তিও দিতে পারেন।' সে পুনরায় গুনাহ করে আর বলে, 'হে আমার রব, আমার গুনাহ মাফ করে দিন।' এরপর আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'আমার বান্দা গুনাহ করেছে আর তারপর বুঝতে পেরেছে, তার এক রব রয়েছেন যিনি গুনাহের জন্য ক্ষমা করতে পারেন, আবার শাস্তিও দিতে পারেন।' সে আবারও গুনাহ করে আর বলে, 'হে আমার রব, আমার গুনাহ মাফ করে দিন।' তারপর আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'আমার বান্দা গুনাহ করেছে আর এরপর বুঝতে পেরেছে, তার এক রব রয়েছেন যিনি গুনাহের জন্য ক্ষমা করতে পারেন, আবার তার বিচারও করতে পারেন। আমি আমার বান্দাকে ক্ষমা করে দিলাম। তার যা ইচ্ছা সে তা করুক।'" (সহীহ বুখারি, হাদিস নং : ৭৫০৭)

[৪৬] আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَٰلِكَ ذِكْرَىٰ لِلذَّاكِرِينَ

"আর দিনের দুই প্রান্তেই নামায ঠিক রাখবে এবং রাতের প্রান্তভাগে পূর্ণ কাজ অবশ্যই পাপ দূর করে দেয়। যারা স্মরণ রাখে তাদের জন্য এটি এক মহাস্মারক।" (সূরা হুদ, ১১ : ১১৪)

[৪৭] মুমিনদের জন্য দু'আ করা নবিদের সুন্নাহ ছিল। নূহ عليه السلام আল্লাহর কাছে দু'আ করেছিলেন,

رَّبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِمَن دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا تَبَارًا

"হে আমার রব, আপনি আমাকে, আমার পিতা-মাতাকে, যারা মুমিন হয়ে আমার গৃহে প্রবেশ করে তাদের এবং মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারীদের ক্ষমা করুন এবং জালিমদের কেবল ধ্বংসই বৃদ্ধি করুন।" (সূরা নূহ, ৭১ : ২৮)

[৪৮] ইবনে আব্বাস رضي الله عنه হতে বর্ণিত, "বানু সা'ঈদাহর নেতা সা'দ ইবনু উবাদাহ رضي الله عنه-এর মা মারা গেলেন। তখন তিনি অনুপস্থিত ছিলেন। তারপর তিনি নবির ﷺ নিকট এসে বললেন, 'হে আল্লাহর রাসূল, আমার অনুপস্থিতিতে মা মারা গেছেন। এখন আমি যদি তার পক্ষ থেকে সদকাহ করি, তবে তা কি তার কোনো উপকারে আসবে?' তিনি বলেন, 'হ্যাঁ।' সা'দ (রা) বললেন, 'তাহলে আপনাকে সাক্ষী করে আমি আমার মিখরাফের বাগানটি তার জন্য সদকাহ করলাম'।" (সহীহ বুখারি, হাদিস নং : ২৭৬২)

[৪৯] রাসূল ﷺ বলেছেন, "আমি কিয়ামাতের দিন মানবজাতির নেতা হব এবং আমিই প্রথম ব্যক্তি যার কবর খুলে যাবে। আমিই প্রথম সুপারিশকারী। আর আমার সুপারিশই সবার প্রথমে গ্রহণ করা হবে।" (সহীহ মুসলিম, হাদিস নং : ২২৭৮)

সেগুলো তার গুনাহসমূহ মুছে দেয়।[৫০]

৮) অথবা আল্লাহ তা‘আলা তাকে কবরের মধ্যে ফিতনায় ফেলেন আর গুনাহগুলো মাফ করে দেন।

৯) কিংবা আল্লাহ তা‘আলা তাকে কিয়ামতের দিনের ভয়াবহতা দিয়ে ফিতনায় ফেলেন আর তা তার গুনাহগুলো মিটিয়ে দেয়।

১০) আর যখন পরম দয়াময় তার প্রতি দয়া প্রদর্শন করেন।”

ইবনে তাইমিয়া ﷺ এরপর বলেন,

فَمَنْ أَخْطَأَتْهُ هَذِهِ الْعَشَرَةُ فَلَا يَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ

“যে এই দশটি কাজে লাগাতে ব্যর্থ হয়, সে যেন কেবল নিজেকেই দোষারোপ করে।”[৫১]

প্রথম দুইটি উপায় আবার পড়ুন। স্বর্ণ দিয়ে বাঁধাই করে রাখার মতো এই কথাগুলোই হয়তো আমাদের ভুলে যাওয়া এই সুন্নাহকে আবার মনে করিয়ে দেবে। এই সুন্নাহটি যেন মরিয়া হয়ে চিৎকার করছে, সকল গুনাহগারকে কাতরকণ্ঠে অনুরোধ করছে আবার একে জীবিত করতে।

রাসূল ﷺ বলেন,

ما من رجلٍ يذنب ذنباً، ثمَّ يقوم فيتطهر، ثمَّ يصلِّي - وفي رواية: ركعتين - ثمَّ يستغفر الله إلا غفر الله له

“যদি কেউ কোনো গুনাহ করে ফেলে, তারপর পবিত্রতা অর্জন করে দুই রাকাত সালাত আদায় করে আর আল্লাহর নিকট ক্ষমা চায়, তবে আল্লাহ তা‘আলা তাকে ক্ষমা করে দেবেন।”[৫২]

আমাদের সকলের দ্বারাই গুনাহ হচ্ছে। কম কিংবা বেশি। রাসূল ﷺ বলেন,

---

[৫০] রাসূল ﷺ বলেছেন, “একজন মুসলিমের ওপরে এমন কোনো বিপদ আসে না, যার দ্বারা আল্লাহ তার গুনাহ ক্ষমা করেন না। এমনকি যখন তার গায়ে কাঁটা ফুটে তখনো।” (সহীহ বুখারি, হাদিস নং : ৫৬৪০)

[৫১] মাজমু ফতওয়া : ১০/৪৫-৪৬

[৫২] তিরমিযী, হাদিস নং : ৩২৭৬

كُلُّ ابْنِ آدَمَ خَطَّاءٌ

"সকল আদম সন্তানই পাপী।"[৫৩]

তবে মহান আল্লাহ তা'আলা আমাদের আশার বাণী শুনিয়েছেন,

قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّـهِ إِنَّ اللَّـهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ

"বলুন, হে আমার বান্দাগণ, যারা নিজেদের ওপর জুলুম করেছ, তোমরা আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ সমস্ত গুনাহ মাফ করেন। তিনি ক্ষমাশীল। পরম দয়ালু।"[৫৪]

তাই গুনাহ হয়ে গেলে তওবা করুন। দুই রাকাত সালাত আদায় করে কেঁদে-কেটে আল্লাহর তা'আলার কাছে ক্ষমা চান।

বারবার এই সুন্নাহর প্রয়োগ করুন। নিরাশ হবেন না।

[৫৩] তিরমিযী, হাদিস নং : ২৬৮৭
[৫৪] সূরা যুমার, ৩৯ : ৫৩

“আমি জানি না” বলতে পারা

“আমি জানি না”

কথাটা নিজের অজ্ঞতা বহন করে। সে হিসেবে চিন্তা করে আমরা অনেকেই এটা স্বীকার করতে লজ্জাবোধ করি। নিজের অজ্ঞতা স্বীকার করতে আমাদের কষ্ট হয়। ইগোতে লাগে। আলেমদের কথা বাদ দিই, অনেক ছাত্র, দীনের প্রচারক, পাবলিক স্পিকার এমনকি সেদিনই ইসলাম নিয়ে পড়াশোনা শুরু করেছেন—

➥ এ ধরনের লোকদের কাছ থেকে এ কথা আর শোনা যায় না,

- “মাফ করবেন! এ ব্যাপারে আমি জানি না।”
- “এ প্রশ্নের উত্তর আমার কাছে নেই।”
- “ক্ষমা করবেন! এখন তো জানি না। তবে জেনে আপনাকে জানাচ্ছি, কেমন?”

এ কারণেই ইবনে সারহ ﷀ বলেছিলেন,

وقد صار «لا أدري» عند أهل زماننا هذا عيبًا!

“আমাদের সময়ে ‘আমি জানি না’ বলাটাকে লজ্জাজনক ভাবা হয়!”[৫৫]

আল্লাহু আকবার! ইবনে সারহ ﷀ এ কথা তার সময়ের লোকদের ব্যাপারে বলেছেন। তিনি ২৫০ হিজরীতে মারা গিয়েছিলেন। সেটা আজ থেকে প্রায় ১২০০

[৫৫] আরশি‘ফু মুলতাকা আহলিল হাদিস : ৩, ১০১/৪৭২

বছর আগের কথা। সে সময়ের চেয়ে আমরা এখন ইলম-আমলে অনেক পিছিয়ে আছি। তাহলে আমাদের জন্য তো কথাটা আরও বেশি প্রযোজ্য।

আমাদের রাসূল ﷺ ছিলেন মানুষের মধ্যে সবচেয়ে জ্ঞানী ব্যক্তি। কিন্তু তারপরেও তিনি 'আমি জানি না' বলতে লজ্জা পেতেন না। তিনি বলেছেন,

مَا أَدْرِي تُبَّعٌ أَلَعِينًا كَانَ أَمْ لَا؟ وَمَا أَدْرِي ذُو الْقَرْنَيْنِ أَنَبِيًّا كَانَ أَمْ لَا؟ وَمَا أَدْرِي الْحُدُودَ كَفَّارَاتٌ لِأَهْلِهَا أَمْ لَا

"আমি জানি না তুব্বা অভিশপ্ত কি না। যুলকারনাইন নবি ছিলেন কি না তাও আমার জানা নেই। আমার তো এটাও জানা নেই, হদের শাস্তি কারও গুনাহ ধুয়ে ফেলে কি না।"[৫৬]

রাসূল ﷺ-এর এই অসাধারণ বিনয় আর কথা বলার ক্ষেত্রে সাবধানতা সাহাবা এবং আমাদের সালাফদের খুবই প্রভাবিত করেছিল।

রাসূল ﷺ এর সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ সাহাবি আবু বকর رضي الله عنه বলতেন,

أَيُّ سَمَاءٍ تُظِلُّنِي، وَأَيُّ أَرْضٍ تُقِلُّنِي؟ إِذَا أَنَا قُلْتُ فِي كِتَابِ اللَّـهِ مَا لَا أَعْلَمُ

"কোন আকাশ আমাকে ছায়া দেবে আর কোন জমিন আমাকে বহন করবে, যদি আমি কুরআন সম্পর্কে না জেনে কথা বলি?"[৫৭]

সাহাবি ইবনে মাসউদ رضي الله عنه বলতেন,

مَنْ أَفْتَى النَّاسَ فِي كُلِّ مَا يَسْتَفْتُونَهُ فَهُوَ مَجْنُونٌ

"যে মানুষের সব প্রশ্নের উত্তর দেয়, সে একজন উন্মাদ।"[৫৮]

আব্দুর রহমান ইবনে আবু লায়লা رحمه الله বলেন,

"আমি রাসূল ﷺ-এর ১২০ জন সাহাবির সাথে দেখা করেছি। তাদের

[৫৬] বায়হাকী, হাদিস নং : ১৭৫৯৫
[৫৭] তাফসীর ইবনে কাসির : ১/১১
[৫৮] ইবানাতুল কুবরা : ১/৪১৮

একজনকে একটি প্রশ্ন জিজ্ঞেস করা হলে তারা অপরজনকে জিজ্ঞেস করতে বলতেন। সেই অপরজনকে জিজ্ঞেস করলে তিনি আবার আরেকজনকে জিজ্ঞেস করতে বলতেন। এভাবে জিজ্ঞেস করতে করতে আবার প্রথম ব্যক্তির কাছে ফেরত আসতে হতো। প্রত্যেকেই আশা করত, তার অপর ভাই তাকে উত্তর দেয়ার বোঝা থেকে রক্ষা করবেন।"[৫৯]

ফিকহের জগতে কিংবদন্তি আলেম ইমাম মালিক ﵀-কে একবার একটি ব্যাপারে প্রশ্ন করা হয়েছিল। উনি উত্তর দিলেন, "আমার জানা নেই।" প্রশ্নকারী তাকে উত্তর দেয়ার অনুরোধ করে বলল, "আরে এটা তো সামান্য একটা ব্যাপার (উত্তর দিয়েই দিন না!)।" এ কথা শুনে ইমাম মালিক ﵀ প্রচণ্ড রেগে গিয়ে বললেন,

ليس في العلم شيء خفيف، ألم تسمع قوله جل ثناؤه: إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا

"ইলমের কোনো ব্যাপারই সামান্য না। তুমি কি কুরআনের এ আয়াতটি[৬০] পড়োনি—'নিশ্চয়ই আমরা তোমার প্রতি এক অতি ভারী বাণী নাযিল করেছি'?"[৬১]

আল্লাহু আকবার!

তারা 'আমি জানি না' বলতে একটুও লজ্জা পেতেন না। ভয় পেতেন না। কারণ, তারা জানতেন তাদের উত্তর হচ্ছে আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রাসূল ﷺ-এর পক্ষ থেকে সিগনেচারস্বরূপ। একই কথা আপনার ক্ষেত্রেও হয়তো খাটে! আপনাকে আল্লাহ তা'আলা একটি প্ল্যাটফর্মে ইসলাম প্রচারের সুযোগ দিয়েছেন। বহু মানুষ আপনার কথা শোনে। মানার চেষ্টা করে। তাই আপনি যদি কোনো মতামত, লেকচার, পোস্ট, কমেন্ট অজ্ঞাতবশত করেন, তবে জেনে রাখুন আপনি একটি জাল স্বাক্ষর দিলেন। এ জালিয়াতি আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রাসূল ﷺ-এর সাথে। একবার এটার ভয়াবহতা নিয়ে চিন্তা করুন।

আমাদের সময়ে সবারই সব বিষয়ে কোনো না-কোনো মতামত আছে। সেটা নিকাবের ব্যাপারে হোক, দাড়ি রাখার ব্যাপারে হোক কিংবা কুরআনের কোনো

---

[৫৯] বাদায়িউল ফাওয়াইদ : ৩/২৭৫-২৭৬
[৬০] সূরা মুযযাম্মিল, ৭৩ : ৫
[৬১] বাদায়িউল ফাওয়াইদ : ৩/২৭৬

আয়াত অথবা রাসূল ﷺ-এর কোনো হাদিসের ব্যাপারে হোক। ইসলামের ব্যাপারে কথা বলা আমাদের কাছে একদম মামুলি ব্যাপার। আমরা অনেক কিছু জানার ভাব ধরি। এ কারণেই শা'বী রহিমাহুল্লাহ, হাসান বসরী রহিমাহুল্লাহ ও আল আসাদী রহিমাহুল্লাহ বলতেন,

إن أحدكم ليفتي في المسألة، لو وردت على عمر بن الخطاب لجمع لها أهل بدر

"তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ এমন সব ব্যাপারে ফতওয়া দিয়ে ফেলে, যদি উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু-কে সে ব্যাপারে প্রশ্ন করা হতো, উনি পরামর্শের জন্য সব বাদরি সাহাবিদের একত্র করতেন।"[৬২]

➥ আমাদের সালাফরা সবাইকে সাবধান করে যা যা বলেছেন তা আবার পড়ুন। এ ব্যাপারগুলো বোঝার চেষ্টা করুন :

➢ আপনার সব ব্যাপারে মতামত থাকার প্রয়োজন নেই।

➢ আর যদি মতামত থেকেই থাকে, তবে তা প্রচার করার প্রয়োজন নেই।

➢ তারপরেও যদি প্রচার করতেই হয়, তবে তা একেবারে সবাইকে জানানোর দরকার নেই।

➢ তাও যদি সবাইকে জানাতেই হয়, তবে সংশোধন করা হলে রেগে যাওয়ার প্রয়োজন নেই।

এরপর থেকে কোনো বিষয়ে মতামত দেয়ার আগে ঠিকমতো ভাবুন। যা বলছেন সে ব্যাপারে আপনি নিশ্চিত তো? যদি না জানা থাকে কিংবা আপনার মধ্যে কোনো সংশয় থেকে থাকে, তবে নির্দ্বিধায় বলুন—"আমি জানি না।" এটা বলা মানেই আপনি ছোট হয়ে গিয়েছেন এমন না। ইমাম মালিক রহিমাহুল্লাহ বলতে পেরেছেন, সম্মানিত সাহাবিরাও বলতে পেরেছেন, এমনকি রাসূল ﷺ-ও নিঃসংকোচে 'আমি জানি না' বলতে পেরেছেন। আমরা কি তাঁদের চেয়েও বড় কেউ? আমাদের সম্মান কি তাঁদের চেয়েও বেশি?

আমার-আপনার 'আমি জানি না' বলতে লজ্জা কোথায়?

[৬২] বাদায়িউল ফাওয়াইদ : ৩/২৭৬

থেকেও না থাকা

আলেমদের সামনে বসে তাদের কথা শুনতে পারা খুবই ভাগ্যের ব্যাপার। তাদের পায়ের সামনে চুপচাপ বসে থাকলেও অনেক কিছু শেখা যায়। তাহলে নবিদের কাছে থাকতে পারলে কী অসাধারণ অভিজ্ঞতা হতো ভাবা যায়? আর যদি সাহাবাদের সাথে সর্বকালের শ্রেষ্ঠ মানব রাসূল ﷺ-এর সঙ্গ পাওয়া যেত, তাহলে? আল্লাহু আকবার!

শুধু আল্লাহ তা'আলাই জানেন কতই-না অসাধারণ ও পবিত্র ছিল সেই আসরগুলো। রাসূল ﷺ সাহাবাদের জান্নাত-জাহান্নামের কথা মনে করিয়ে দিতেন। আল্লাহ তা'আলাকে ভয় করতে বলতেন। সেখানে কোনো অশ্লীল কথাবার্তা হতো না। অনর্থক বাক্যালাপে তাঁরা ঘণ্টার পর ঘণ্টা নষ্ট করতেন না। এত পাপ-পঙ্কিলতামুক্ত বৈঠকে থেকেও রাসূল ﷺ বারবার আল্লাহ তা'আলার কাছে ক্ষমা চাইতেন।

সাহাবি ইবনে উমার رضي الله عنهما এ ব্যাপারটি লক্ষ করেছিলেন। তিনি বলেন, "শুধু এক বৈঠকেই আমরা এক শ বার গুনতে পারতাম যে,

রাসূল ﷺ বলছেন,

رَبِّ اغْفِرْ لِي، وَتُبْ عَلَيَّ، إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ

'হে আমার রব, আমাকে ক্ষমা করে দিন। আমার তওবা গ্রহণ করুন। আপনি

তো সেই দয়াময় সত্তা যিনি তওবা কবুল করেন।'[৬৩]

তাঁর দেহ ছিল সাহাবাদের সাথে। তাদের সাথে তিনি গল্প করতেন। তাদের কথা শুনতেন। তাদের আনন্দে তিনিও আনন্দিত হতেন। কেউ কষ্ট পেলে তাকে সান্ত্বনা দিতেন। কিন্তু তাঁর মন? সেটা জুড়ে ছিল তাঁর স্রষ্টার সাথে। সে অন্তর সামান্য সময় তাঁর রবকে স্মরণ করতে না পারলে অস্থির হয়ে উঠত।

➡ আমাদের সময়ে এই সুন্নাহটি এত প্রয়োজনীয় কেন?

যদি রাসূল ﷺ সাহাবাদের সাথে থেকেই এক শ বার আল্লাহ তা'আলাকে স্মরণ করেন, তাঁর কাছে ক্ষমা চান, তাহলে আমাদের কতবার আল্লাহ তা'আলাকে স্মরণ করা উচিত? তাঁর কাছে ক্ষমা চাওয়া উচিত? আমাদের আড্ডা তো অশালীন কথা ছাড়া চলেই না। অনেক ভদ্র আলাপচারিতাতেও আমরা ইসলামের কথা বলতেই লজ্জা পাই। আর যদি বলিও, তবে আমাদের উপস্থাপনার দুর্বলতায় হোক আর ঈমানের দুর্বলতায় হোক, তারা আমাদের কথা শুনতেও চায় না।

অনেক সময় না চাইলেও আমাদের এমন সব লোকদের সাথে বসতে হয় যাদের আমরা পছন্দ করি না। তাদের সাথে খুব বেশি কথা বলতে চাই না। আমাদের ভয় হয়, তাদের সাথে বসলে আমাদের উপকারের চেয়ে ক্ষতিই বেশি হবে। নোংরা চিন্তায় অন্তরটা কলুষিত হয়ে যাবে। কিন্তু পরিবেশ আমাদের বাধ্য করে। আমরা সবাই-ই কম-বেশি এমন পরিস্থিতিতে পড়েছি। এ অবস্থায় করণীয় কী?

এই সুন্নাহর প্রয়োগ করুন। আমাদের সময়ে এটির কোনো বিকল্প নেই।

ইমাম ইবনুল কায়্যিম رحمه الله এ বিব্রতকর অবস্থার কথা বলতে গিয়ে অলংকারপূর্ণ ভাষায় বলেছেন,

"কখনো কখনো কাউকে যদি বাধ্য হয়ে মাত্রাতিরিক্ত 'মুবাহাত'[৬৪]-এর বৈঠকে থাকতে হয়, তবে সে যেন এ ধরনের আসরকে তার সাধ্য অনুযায়ী আল্লাহর আনুগত্যের মজলিসে রূপান্তরের চেষ্টা করে।

---

[৬৩] আবু দাউদ, হাদীস নং : ১৫১৬

[৬৪] المباحات (মুবাহাত)। এটি বলতে এমন কিছু বিষয়কে বোঝানো হয় যা সওয়াব কিংবা গুনাহ কোনোটিই নিয়ে আসে না। কিন্তু এ ব্যাপারগুলোতে খুব বেশি লিপ্ত থাকা প্রশংসনীয় নয়।

সে যেন নিজের মধ্যে সাহস রাখে। নিজের অন্তরকে দৃঢ় করে। শয়তানের কথায় কান না দেয়। শয়তান তো ফিসফিস করে বলবেই, 'তুমি তো লোক দেখানোর জন্য এমন করছ। তুমি আসলে চাচ্ছ সবাই যাতে তোমাকে আলাদা নজরে দেখে।'

শয়তানের এই ধোঁকাকে একটুও পাত্তা দেয়া যাবে না। আল্লাহর সাহায্য চাইতে হবে। আর নিজের সাধ্য অনুযায়ী সবাইকে প্রভাবিত করার চেষ্টা করতে হবে।"[৬৫]

কিন্তু যদি এমন কোনো উপায় না থাকে? যদি মজলিসটা এমন হয় যে, সেখানে না ইসলামের কথা বলা যাবে আর না সেখানে থেকে চলে আসা যাবে?

➡ ইবনুল কায়্যিম ﷫ সে ক্ষেত্রে চমৎকার একটি সমাধান দিয়েছেন :

"কিন্তু সত্যিই যদি কেউ তা না করতে পারে, তবে সে যেন ওই মজলিস থেকে নিজের অন্তরকে এমনভাবে সরিয়ে নেয় যেভাবে সে ময়দার তাল থেকে আঁশ ছড়িয়ে নেয়। সে যাতে সেখানে থেকেও না থাকে। তাদের কাছে থেকেও দূরে থাকে। জেগেও ঘুমিয়ে থাকে। সে তাদের দেখেও দেখছে না। শুনেও শুনছে না। কারণ, সে তার মনকে তাদের কাছ থেকে সরিয়ে ফেলেছে। নিয়ে গেছে সবচেয়ে ওপরে। আরশের পাশে সব পবিত্র রুহের সাথে।

সে মন আল্লাহর প্রশংসা করছে। তাঁর মহিমার কথা বলছে।"[৬৬]

এমনটা করতে পারা খুবই কঠিন। সেটা স্মরণ করিয়ে দিয়ে ইমাম ইবনুল কায়্যিম ﷫ এই বলে শেষ করেন :

وما أصعب هذا وأشقه على النفوس، وإنه ليسير على من يسره الله عليه

"যে কারোর অন্তরের জন্য এটা কতই-না দুঃসাধ্য! তবে তার জন্য নয়, যার জন্য আল্লাহ তা সহজ করে দেন।"[৬৭]

---

[৬৫] মাদারিজুস সালেকীন : ১/৪৫৩-৪৫৪
[৬৬] মাদারিজুস সালেকীন : ১/৪৫৪
[৬৭] মাদারিজুস সালেকীন : ১/৪৫৪

“ওকে দেখছি না যে?”

সব সময় বলে বলে মানুষের মধ্যে পরিবর্তন আনা যায় না। মাঝে মাঝে তাদের অনুভব করিয়ে বোঝাতে হয়। তাদের দিকে মমতার হাত বাড়িয়ে দিতে হয়। রাসূল ﷺ-এর ছিল মানুষকে প্রভাবিত করার অসাধারণ ক্ষমতা। তাই এ দিকটিতে তিনি কড়া নজর রাখতেন। সবার খেয়াল রাখতেন।

বুরাইদা رضي الله عنه বলেন,

> “রাসূল ﷺ আনসারদের খোঁজখবর নিতেন। যারা অসুস্থ হতো তাদের দেখতে যেতেন এবং তাদের অবস্থার ব্যাপারে সবাইকে জিজ্ঞেস করতেন।”[৬৮]

তিনি প্রচণ্ড ব্যস্ত থাকতেন। স্ত্রীদের সময় দিতেন, মসজিদে ইমামতি করতেন, মানুষকে নসীহা দিতেন, আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করতেন। তারপরেও ব্যক্তিবিশেষের খবর নিতে তিনি ভুলতেন না।

❋ তাবুকের যুদ্ধের কথাই একবার ভাবুন। সে যুদ্ধে মুসলিম শিবিরে ত্রিশ হাজার সাহাবি ছিলেন। এত বিশাল সেনাবাহিনীর মধ্যে থেকেও তিনি কাব ইবনে মালিক رضي الله عنه-এর কথা ভুলে যাননি। কাব ইবনে মালিক رضي الله عنه-কে দেখতে না পেয়ে তিনি সবাইকে জিজ্ঞেস করলেন,

مَا فَعَلَ كَعْبُ بْنُ مَالِكٍ

[৬৮] আল-হাকিম, হাদিস নং : ১৪১৬

"কাব ইবনে মালিকের কী হয়েছে?"[৬৯]

❋ আবু হুরাইরা ﷺ থেকে বর্ণিত, "কৃষ্ণবর্ণের এক মহিলা মসজিদে ঝাড়ু দিত। একদিন সে মারা গেল। রাসূল ﷺ তার ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলে তাঁকে বলা হলো, 'ওই মহিলা মারা গিয়েছে।' রাসূল ﷺ তখন বললেন,

أَفَلاَ كُنْتُمْ آذَنْتُمُونِي بِهِ دُلُّونِي عَلَى قَبْرِهِ

'তোমরা আমাকে জানাওনি কেন? আমাকে তার কবর দেখিয়ে দাও।'তারপর তিনি তার কবরে গেলেন এবং জানাযার সালাত আদায় করলেন।"[৭০]

❋ অনুশোচনায় সাবিত ইবনে কায়েস ﷺ যখন সবার সাথে দেখা করা বন্ধ করে দিয়ে বাসায় নিজেকে বন্দী করে রেখেছিলেন, তখন তা আর কারও নজরে না এলেও রাসূল ﷺ-এর নজরে ঠিকই এসেছিল। সাবিত ইবনে কায়েস ﷺ ভেবেছিলেন তিনি জাহান্নামের অধিবাসী হয়ে গেছেন। জাহান্নামের আগুন ছাড়া তার আর কোনো ঠিকানা নেই আখিরাতে।

রাসূল ﷺ তখন তার উদ্দেশ্যে বলেছিলেন,

بَلْ هُوَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ

"(জাহান্নামে নয়) সে তো জান্নাতে থাকবে।"[৭১]

একবার চিন্তা করে দেখুন তো, সাবিত ﷺ-এর অবস্থা কতটা শোচনীয় হতো যদি রাসূল ﷺ তার খবর জানতে না চাইতেন? আমরা কি জানি কত সাবিত আজ একই অবস্থায় আছে? প্রিয়জনদের কাছ থেকে মমতার একটি শব্দ শোনার হাহাকারে তাদের জীবনটা কাটাচ্ছে? আমাদের সবার জীবনেই এমন কাছের মানুষ আছে। যারা আমাদের একটি ফোন, একটি মেসেজের জন্য পথ চেয়ে থাকে। কিন্তু আমাদের সময় হয়ে ওঠে না।

তবে রাসূল ﷺ ঠিকই সময় বের করতে পারতেন। শুধু রাসূল ﷺ নয়, এটা অন্যান্য নবিদেরও সুন্নাহ ছিল। সুলাইমান ﷺ-এর রাজ্যে মানুষ, পশু-পাখি,

---

[৬৯] সহীহ মুসলিম, হাদিস নং : ২৭৬৯
[৭০] সহীহ বুখারি, হাদিস নং : ৪৫৮
[৭১] সহীহ মুসলিম, হাদিস নং : ১১৯

জিন—সবই ছিল। তারপরেও শুধু একটি পাখির না থাকাটা তার নজর এড়িয়ে যায়নি। তিনি বলেছিলেন,

مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ

"কী ব্যাপার! হুদহুদকে তো দেখছি না। নাকি সে আসেইনি?"[৭২]

এরাই হচ্ছেন প্রকৃত পুনর্জাগরণকারী। তাঁরা ব্যক্তিবিশেষ থেকে শুরু করে পুরো জাতিকে বদলে দিতে পারতেন। আজকের দিনে আধুনিক প্রযুক্তির সুবিধার কথা বলা শুরু করলে হয়তো থামা কঠিন হয়ে যাবে। কিন্তু এ প্রযুক্তি আমাদের কাছ থেকে অনেক কিছু নিয়েও গেছে। আজ প্রযুক্তির বাতুলতায় আমাদের কাছ থেকে হারিয়ে গেছে অতি মূল্যবান এই সুন্নাহটি।

ইসলামিক যে পোস্ট কিংবা মেসেজগুলো আমরা আমাদের সোশাল মিডিয়াতে শেয়ার করি তার অনেক গুরুত্ব রয়েছে। কিন্তু সেখানেই আমাদের দায়িত্ব শেষ না; বরং সেখান থেকেই শুরু। হাঁ, আমরা হয়তো নিজেদের সময় বাঁচিয়েছি, অল্প সময়ে অনেককে দাওয়াহ দিয়েছি। কিন্তু মানুষকে বদলে দিতে প্রয়োজন আরও একটু মমতা। তাকে একটু আলাদা চোখে দেখা। ভালোবাসার অদৃশ্য হাত বাড়িয়ে দেয়া।

➥ ব্যস্ত দিন থেকে কিছুটা সময় বের করে তাদের মেসেজ দেয়া :

➢ "নাফিস! কী অবস্থা তোমার?"

➢ "আসিফ! অনেকদিন হয়েছে তোমার সাথে দেখা হয় না। তুমি ভালো আছো তো?"

➢ "রনি! তুমি চলে যাওয়ার পর আসরের পর নিজেকে খুব একা একা লাগে।"

আমরা নিজেরাও জানি এমন একটি মেসেজ পেলে আমাদের কতটা ভালো লাগে। সে মানুষটার প্রতি তখন আমরা গভীর মমতা অনুভব করি। অনেক সময় এমনও হয়, শায়খ তার কথা জানতে চাইবে বলে অনেকে লজ্জায় মসজিদে ক্লাস করতে যায়। যত সমস্যাই থাকুক, কখনো ক্লাস মিস দেয় না। আমি জানি, আপনি ব্যস্ত। ব্যস্ত তো আমিও। তবে আমরা নিশ্চয়ই নবিদের চেয়ে বেশি ব্যস্ত না। তাঁরা ঠিকই সময় বের করতে পারতেন। একটু ইচ্ছা থাকলে হয়তো আমরাও পারব।

[৭২] সূরা আন-নামাল, ২৭ : ২০

দৃষ্টি যখন আকাশে

রাসূল ﷺ-এর আরেকটি সুন্নাহ যা অনেকেই ভুলে গিয়েছে। যে সুন্নাহটি আমাদের জানিয়ে দেয় রাসূল ﷺ-এর অন্তর আসলে কোথায় জুড়ে ছিল। সব সময় কার স্মরণে ব্যস্ত থাকত। রাসূল ﷺ বলেছেন,

"যে ব্যক্তি পরিপূর্ণভাবে ওযু করবে, তারপর আকাশের দিকে তাকিয়ে[৭৩] বলবে,

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

'আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ ছাড়া কোনো সত্য ইলাহ নেই, তাঁর কোনো শরীক নেই। আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি, মুহাম্মাদ ﷺ তাঁর বান্দা ও রাসূল।'

জান্নাতের আটটি দরজাই তার জন্য খুলে দেয়া হবে। ওই ব্যক্তি যে দরজা দিয়ে ইচ্ছা করবে, সে দরজা দিয়েই প্রবেশ করতে পারবে।"[৭৪]

প্রায়ই রাসূল ﷺ এ কাজটি করতেন। গভীর মনোযোগে আকাশের দিকে তাকাতেন। এক সাহাবির বর্ণনায়,

وَكَانَ كَثِيرًا مِمَّا يَرْفَعُ رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاءِ

"আর তিনি (রাসূল ﷺ) প্রায়ই আকাশের দিকে মাথা তুলতেন।"[৭৫]

---

[৭৩] 'আকাশের দিকে তাকিয়ে' এ অংশটুকুর সনদ দুর্বল।-শার'ঈ সম্পাদক

[৭৪] সুনানে নাসাঈ, হাদিস নং : ১৪৯

[৭৫] সহীহ মুসলিম, হাদিস নং : ২৫৩১

উম্মুল মুমিনীন সালামাহ ﵂ বলেন, "রাসূল ﷺ যখনই আমার ঘর থেকে বের হতেন, তখনই আকাশের দিকে তাকাতেন। আর বলতেন,

اللهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَضِلَّ أَوْ أُضَلَّ، أَوْ أَزِلَّ أَوْ أُزَلَّ، أَوْ أَجْهَلَ أَوْ يُجْهَلَ عَلَيَّ، أَوْ أَظْلِمَ أَوْ أُظْلَمَ

"হে আল্লাহ, আমি আপনার কাছে আশ্রয় চাই কাউকে পথভ্রষ্ট করা থেকে কিংবা নিজে পথভ্রষ্ট হওয়া থেকে। কাউকে ভুল করানো থেকে কিংবা নিজে ভুল করা থেকে। মূর্খের মতো আচরণ করা থেকে কিংবা অন্য কেউ আমার সাথে মূর্খের মতো আচরণ করুক তা থেকে। কারও ওপর জুলুম করা থেকে কিংবা অন্য কারও আমার ওপর জুলুম করা থেকে।"[৭৬]

এমনকি ঘরে থাকার সময়েও রাসূল ﷺ বারবার ওপরের দিকে তাকাতেন। মৃত্যুর সময়ে রাসূল ﷺ আমাদের মা আয়েশা ﵂-এর ঘরে ছিলেন। সে সময়ের কথা

আয়েশা ﵂ বর্ণনা করেন,

فرفع رأسه إلى السماء وقال : في الرفيق الأعلى . في الرفيق الأعلى

"তারপর তিনি আকাশের দিকে তাকালেন আর বললেন, 'রফিকুল আলার সাথে। রফিকুল আলার সাথে'।"[৭৭]

এমনকি রাসূলের ﷺ বারবার আকাশের দিকে তাকানোর কথা আল্লাহ তা'আলা কুরআনেও উল্লেখ করেছেন :

قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاء

---

[৭৬] তাবারানী, হাদিস নং : ৪১৩

[৭৭] আয়েশা ﵂ বলেন, "যখন রাসূল ﷺ সুস্থ ছিলেন, উনি বলতেন, 'কোনো নবির জান ততক্ষণ পর্যন্ত কবয করা হয় না যতক্ষণ পর্যন্ত না তাঁকে জান্নাতে তাঁর আবাস দেখানো হয় এবং সিদ্ধান্ত নেয়ার সুযোগ দেয়া হয়।' যখন তিনি মৃত্যুর নিকটবর্তী হলেন, তাঁর মাথা ছিল আমার ঊরুতে। তিনি অজ্ঞান হয়ে গেলেন এবং একটু পরে জ্ঞান ফিরে পেলেন। তারপর ঘরের ছাদের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'হে আল্লাহ, আমাকে উচ্চে সমাসীন বন্ধুর সঙ্গে (মিলিত করুন)।' আমি (মনে মনে বললাম) 'তিনি অবশ্যই আমাদের বেছে নেবেন না।' তারপর আমি বুঝতে পারলাম সুস্থ থাকা অবস্থায় তিনি আসলে কী বুঝিয়েছিলেন।"(সহীহ বুখারি, হাদিস নং : ৪৪৬৩)

"নিশ্চয়ই আমি আপনাকে বারবার আকাশের দিকে তাকাতে দেখি।"[৭৮]

এটা সবাই জানে, কোনো কিছুর দিকে বারবার তাকানোর অর্থ হচ্ছে, সে জিনিসটার প্রতি তার হৃদয়ে আলাদা টান রয়েছে। প্রকৃতপক্ষে কখনো কখনো বারবার তাকানোর ফলেই হৃদয়ে আকর্ষণ সৃষ্টি হয়। এ কারণে পবিত্র কুরআনে বিপরীত লিঙ্গের কাউকে দেখলে দৃষ্টি নত রাখতে বলা হয়েছে।[৭৯]

কেউ কি কখনো খেয়াল করেছেন, পবিত্র কুরআনে যতবার 'আসমান ও জমিন' এর কথা বলা হয়েছে, প্রায় সব ক্ষেত্রেই আসমানের কথা আগে বলা হয়েছে?[৮০] এটা মোটেও কোনো কাকতালীয় ব্যাপার না। ভালোভাবে খেয়াল করলে দেখা যায়, যেসব আয়াতে আমাদের চিন্তা-ভাবনা করতে বলা হয়েছে, সেসব আয়াতে আসমানের কথা আগে উল্লেখ করা হয়েছে। এটার পেছনে কি আলাদা কোনো কারণ রয়েছে?

হ্যাঁ! অবশ্যই রয়েছে। আমাদের ওপরে যে আকাশ রয়েছে সেটা অবশ্যই বিশেষ

---

[৭৮] রাসূল ﷺ যখন মদিনায় হিজরত করলেন, সেখানে অধিকাংশ মানুষ ছিল ইহুদি। আল্লাহ তা'আলা তাঁকে বায়তুল মুকাদ্দাসের দিকে ফিরে সালাত পড়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন। এতে ইহুদিরা খুবই খুশি হয়েছিল (কারণ, বায়তুল মুকাদ্দাস তাদেরও কিবলা ছিল)। তিনি কয়েক মাস পর্যন্ত ওই দিকে ফিরেই সালাত আদায় করেন। কিন্তু তাঁর মনোবাসনা ছিল ইব্রাহীম عليه السلام-এর কিবলাহ (অর্থাৎ কাবা)। প্রায়ই তিনি আকাশের দিকে চোখ তুলে তাকাতেন। অবশেষে এই আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। (ইবনে কাসির)

[৭৯] আল্লাহ তা'আলা বলেন,

قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ

وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ

"মুমিনদের বলুন, তারা যেন তাদের দৃষ্টি নত রাখে এবং তাদের লজ্জাস্থানের হেফাযত করে। এতে তাদের জন্য খুব পবিত্রতা আছে। নিশ্চয়ই তারা যা করে আল্লাহ তা জানেন। ঈমানদার নারীদের বলুন, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে নত রাখে এবং তাদের লজ্জাস্থানের হেফাযত করে। (সূরা নূর ২৪ : ৩০-৩১)

[৮০] পবিত্র কুরআনে যেখানে যেখানে "আসমান ও জমিন" এর কথা বলা হয়েছে, তার খুব কম জায়গাতেই জমিনের কথা প্রথমে বলা হয়েছে। যেমন : সূরা বাকারাহর ২৯ নং আয়াতে, সূরা ত্ব-হার ৪ নং আয়াতে। অন্যদিকে, যেসব আয়াতে আসমানের কথা আগে বলা হয়েছে, সেসবের সংখ্যা অনেক বেশি। যেমন : সূরা আরাফের ৫৪ নং আয়াতে, সূরা ইউনুসের ৩ নং আয়াতে, সূরা হুদের ৭ নং আয়াতে, সূরা ফুরকানের ৫৯ নং আয়াতে, সূরা সাজদাহর ৪ নং আয়াতে, সূরা ক্বাফের ৩৮ নং আয়াতে, সূরা হাদীদের ৪ নং আয়াতে, সূরা নাযি'আতের ২৭-৩৩ নং আয়াতে, সূরা শামসের ৫-৬ নং আয়াতে।

কিছু।[৮১]

এই বিস্তৃত আকাশ আপনাকে করুণাময় আল্লাহ্ তা'আলার কথা মনে করিয়ে দেবে। তাঁর স্মরণে আপনার অন্তরকে বিগলিত করে দেবে। তাই চোখ দুটিকে মুক্তভাবে আকাশের দিকে তাকাতে দিন। বিশেষ করে যখন কোনো দু'আ করছেন, কুরআনের কোনো আয়াত নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করছেন। এমনকি এলোমেলো পায়ে যখন আপনি কাজ করতে যান, চলার পথে একটু আকাশের দিকে তাকিয়েই দেখুন না। দেখবেন :

- ➢ কীভাবে আল্লাহর প্রতি আপনার বিনয় বেড়ে যায়।
- ➢ কীভাবে আপনার ভেতরে মানুষকে বেশি সমীহ করার প্রবণতা কমে যায়।
- ➢ কীভাবে আল্লাহ-ভীতি বেড়ে যায়।
- ➢ কীভাবে মানুষকে ভয় পাওয়ার প্রবণতা কমে যায়।
- ➢ কীভাবে শুধু আল্লাহর প্রতি নির্ভরতা এবং আনুগত্য বেড়ে যায়।
- ➢ কীভাবে মানুষের প্রতি নির্ভরতা আর আনুগত্য কমে যায়।[৮২]

---

[৮১] ইমাম বুখারি ﵀ তাঁর সহীহ হাদিসগ্রন্থের একটি অধ্যায়ের নাম দিয়েছেন : رفع البصر إلى السماء অর্থাৎ আকাশের দিকে দৃষ্টি উত্তোলন করা। তিনি সেখানে পবিত্র কুরআনের এ আয়াতকে উদ্ধৃত করেছেন :

أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ

وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ

"তবে কি তারা উটের প্রতি দৃষ্টিপাত করে না, কীভাবে তা সৃষ্টি করা হয়েছে? আর আকাশের দিকে, কীভাবে তা ঊর্ধ্বে স্থাপন করা হয়েছে?" (সূরা গাশিয়াহ, ৮৮ : ১৮-১৯)

[৮২] তবে এটিও মাথায় রাখতে হবে যে, সালাতরত অবস্থায় আকাশের দিকে তাকানো বৈধ নয়। আনাস ইবনু মালিক ﵁ হতে বর্ণিত, "রাসূল ﷺ বলেছেন, 'লোকদের কী হলো যে, তারা সালাতে আকাশের দিকে চোখ তুলে তাকায়?" এ ব্যাপারে তিনি কঠোর বক্তব্য রাখলেন; এমনকি তিনি বললেন, 'যেন তারা অবশ্যই এ হতে বিরত থাকে, অন্যথায় অবশ্যই তাদের দৃষ্টিশক্তি কেড়ে নেয়া হবে'।" (সহীহ বুখারি, হাদিস নং : ৭৫০)

খুব খুশি হলে

আমাদের জীবনটা কাটে আনন্দ-বেদনার দোলাচলে। সেখানে এই তো উল্লাস! আর তারপরেই বেদনায় মুষড়ে পড়া। তবে কারও জীবনই পুরোটা কষ্টে কাটে না। মাঝে মাঝে মহান আল্লাহ তা'আলা তাঁর অপার অনুগ্রহ দিয়ে আমাদের জীবনটাকে আনন্দে পূর্ণ করে দেন। এক অপার্থিব সুখানুভব মনটাকে বিভোর করে ফেলে।

খুব খুশি হলে আমরা কী করি?

জোরে দৌড় দিয়ে শূন্যে ঝাঁপ দিই। শূন্যে থাকা অবস্থাতেই বাতাসে ঘুষি দিই। কিংবা আকর্ণ বিস্তীর্ণ হাসি দিয়ে ভি-সাইন দেখাই।

রাসূল ﷺ খুশি হলে কি করতেন জানেন? অনেকটা আমরা যা করি তার একদম উল্টোটাই করতেন। আমরা তো শূন্যে ঝাঁপ দিই। আর উনি?

➥ সাহাবি আবু হুরাইরা رضي الله عنه-এর মুখেই শোনা যাক :

"রাসূল ﷺ যখন খুব খুশি হতেন কিংবা কোনো আনন্দের সংবাদ শুনতেন, তখন সিজদায় লুটিয়ে পড়তেন।"[৮৩]

ইবনুল কায়্যিম رحمه الله এ ব্যাপারে বলেন, "রাসূল ﷺ এবং তাঁর সাহাবারা যখন কোনো আনন্দের সংবাদ পেতেন কিংবা তাঁদের কাছ থেকে কোনো কষ্ট দূর হয়ে যেত, তাঁরা সিজদায় লুটিয়ে পড়ে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতেন।"[৮৪]

---

[৮৩] সুনানে আবু দাউদ, হাদিস নং : ২৭৭৪

[৮৪] মুখতাসার যাদুল মা'আদ : ১/২৭

ইবনুল কুদামা ﵀ উল্লেখ করেছেন, আবু বকর ﵁ ইয়ামামা যুদ্ধে বিজয়ের সংবাদ শুনে সিজদায় লুটিয়ে পড়েছিলেন। আলী ﵁ ও অন্যান্য সাহাবারাও খুশির সংবাদ পেলে একই কাজ করতেন।[৮৫]

আমাদের সবার জীবনেই এমন খুশির সংবাদ আসে। একটা পরীক্ষায় ফেইল করা নিয়ে আমরা টেনশনে থাকি, তারপর দেখা যায় বেশ ভালোমতোই সে পরীক্ষায় উতরে গিয়েছি।

কিংবা হয়তো আপনি প্রচণ্ড অসুস্থ। কোনো ট্রিটমেন্টই কাজ করছে না। ডাক্তার আপনার ব্লাড টেস্ট করতে দিলেন। আর আপনিও দুরুদুরু বুকে রিপোর্ট হাতে পেয়ে দেখলেন তেমন কিছুই হয়নি।

অথবা হতে পারে, একটি গুনাহ থেকে আপনি বের হতে পারছেন না। অনেক চেষ্টা করেও না। যখনই একা থাকেন, হঠাৎ করে গুনাহ করে ফেলেন। আপনি এ অবস্থা থেকে অনেকদিন ধরে বের হতে চেষ্টা করছেন। তারপর আল্লাহ তাঁর নিজ অনুগ্রহে আপনাকে সে গুনাহ থেকে মুক্ত করলেন। এখন আপনি নিয়মিত তাহাজ্জুদ পড়তে পারেন। ফজরের সালাত জামাতে পড়তে আর সমস্যা হয় না।

এমন আনন্দদায়ক মুহূর্ত যখন আল্লাহ তা‘আলা আপনার জীবনে নিয়ে আসেন, তখন কী করবেন?

➥ সিজদায় লুটিয়ে পড়ুন।

অনেক আলেমের মতে, এই সুন্নাহ পালন করার সময় সালাতের শর্তসমূহ পূরণ জরুরি নয়। তাই যে অবস্থাতে আমরা থাকব, সে অবস্থাতেই সিজদায় লুটিয়ে পড়া যাবে।[৮৬]

---

[৮৫] আল-মুগনী : ১/৪৪৯

[৮৬] শায়খ ইবনে উসাইমিন ﵀ বলেন, “কোনো কষ্ট দূর হলে অথবা কোনো খুশির সংবাদ এলে শোকরের সিজদা আদায় করা হয়। এটা সালাতের বাইরে তিলওয়াতের সিজদা করার মতোই। কোনো কোনো আলেম বলেছেন, এ সিজদার জন্য ওযু করতে হবে এবং তাকবীর দিতে হবে। আবার কেউ কেউ বলেছেন, শুধু প্রথম তাকবীর দিলেই চলবে। তারপর সিজদায় পড়ে যেতে হবে। এরপর বলবে,

سبحان ربي الأعلى

‘আমার রবের পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করছি, যিনি সবার ওপরে।’

তারপর (নিজের পছন্দমতো) দু‘আ করবে।” (ফতওয়া আরকানুল ইসলাম : ১/৩৬২)

কেউ যখন এই সুন্নাহটি পালন করে তখন সে আসলে কী বোঝাতে চাইছে? সে যেন আল্লাহকে বলছে, পৃথিবীর সবাইকে বলছে, নিজেকে নিজেই বলছে, "হে আল্লাহ, আমার নিজের এই ব্যাপারে কোনো ক্ষমতাই ছিল না। নিশ্চয়ই তুমি আমাকে তোমার নিজ অনুগ্রহে এ সফলতা দান করেছ। আল্লাহ গো, এ জন্যই আমি আমার কপাল মাটিতে বিছিয়ে দিয়েছি। আমার বিনম্র কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি তোমাকে।

আর কাউকে নয়, শুধুই তোমাকে।"

যিনি আগুনের মধ্যে হাঁটতে চেয়েছিলেন

‘আল্লাহর ওপর ভরসা করা’

প্রত্যেক নেককার লোকের মধ্যে এই গুণটি রয়েছে। এই গুণটি রপ্ত করতে পারলে সুখের সবচেয়ে বড় দরজাটি আমাদের জন্য খুলে যায়। কোন সে দরজা? সেটি হচ্ছে আল্লাহ তা‘আলাকে ভরসার দরজা। এ বিশ্বাস নিজের মধ্যে রাখা যে, আমার জন্য যা সবচেয়ে ভালো হবে, তিনি আমাকে তা-ই দান করবেন।

এভাবে যারা ভাবতে পারে, তাদের মনে কখনো অস্থিরতা দানা বাঁধতে পারে না। তারা নেগেটিভ কথা বলে সবাইকে হতাশ করে দেয় না। তাদের মানসিকতাই এমনভাবে গড়ে ওঠে যে, মুহূর্তের জন্যেও হতাশা-নিরাশাকে তারা মনের ভেতর স্থান দেয় না। এক অনাবিল প্রশান্তিতে তাদের দেহ-মন বিভোর হয়ে থাকে। কারণ, তারা আল্লাহর ওপর ভরসা রাখে। তাঁর কাছ থেকে সেরাটা আশা করে। আর আসমান ও জমিনের রব তাদের সেরাটাই দেন।

আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي، وَأَنَا مَعَهُ إِذَا ذَكَرَنِي، فَإِنْ ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي، وَإِنْ ذَكَرَنِي فِي مَلَإٍ ذَكَرْتُهُ فِي مَلَإٍ خَيْرٍ مِنْهُمْ، وَإِنْ تَقَرَّبَ إِلَيَّ بِشِبْرٍ تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ ذِرَاعًا، وَإِنْ تَقَرَّبَ إِلَيَّ ذِرَاعًا تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ بَاعًا، وَإِنْ أَتَانِي يَمْشِي أَتَيْتُهُ هَرْوَلَةً

"আমার বান্দার প্রতি আমি ঠিক তেমন যেমনটা সে আমার প্রতি ধারণা করে। আর আমি তার সাথে সাহায্য-সহযোগিতা নিয়ে থাকি, যখন সে আমাকে স্মরণ করে। তাই সে যদি আমাকে মনে মনে স্মরণ করে, তাহলে আমিও তাকে আমার মনে স্মরণ করি। সে যদি কোনো মজলিসে আমাকে স্মরণ করে, তাহলে আমি তাকে তাদের চেয়ে উত্তম ব্যক্তিদের মজলিসে স্মরণ করি।"[৮৭]

এর চেয়ে আনন্দের আর কী হতে পারে যে, আমরা আমাদের রবের কাছ থেকে যা আশা করব তিনি আমাদের ঠিক তা-ই দেবেন? খুব কম মানুষই এমন করে ভাবতে পারে। এমন শান্তির জীবন নিয়ে বাঁচতে পারে।

তেমনি একজন মানুষ ছিলেন শায়খুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমিয়া ﷬। যার মন ছিল তার রবের প্রতি আস্থায় পরিপূর্ণ। একবার বিদআতিদের সাথে বিতর্কের সময় তিনি আল্লাহ তা'আলার প্রতি অবিচল আস্থা দেখিয়েছিলেন।[৮৮] যারা তা দেখেছে, আর যারা তা শুনেছে—কারও পক্ষেই তা ভোলা সম্ভব নয়।

এই বিদআতিরা খুব বিখ্যাত হয়ে ওঠে। এরা নানা ধরনের ছলচাতুরী করতে পারত। আগুনের মধ্যে দিয়ে হেঁটে তারা লোকজনকে অবাক করে দিত। তাই মানুষজন মুগ্ধ হয়ে তাদের অনুসরণ করা শুরু করল। ইবনে তাইমিয়া ﷬ সবাইকে তাদের প্রতারণা বোঝালেন। তিনি লোকদের বললেন, কোনো অলৌকিকতা নয়, আসলে এই লোকগুলো তাদের গায়ে বিভিন্ন আগুন-নিরোধক পদার্থ মেখে আগুনের মধ্যে হাঁটছে। কিন্তু কে শোনে কার কথা!

অবস্থা বেগতিক দেখে ইবনে তাইমিয়া ﷬ একদিন এ লোকগুলোর সাথে তর্কে অংশ নিলেন। বিতর্কের একপর্যায়ে উত্তেজনা চরম আকারে পৌঁছাল। বিতর্ক সেদিনের জন্য স্থগিত করা হলো। উভয়পক্ষই পরদিন আবার তর্কে অংশ নিতে রাজি হলো। সেদিনকার অনুভূতির কথা বলতে গিয়ে ইবনে তাইমিয়া ﷬ বলেন,

"সেদিন আমি ইস্তিখারা সালাত[৮৯] পড়লাম। আল্লাহ তা'আলার কাছে

---

[৮৭] সহীহ বুখারি, হাদিস নং : ৭৪০৫

[৮৮] শরহুল আকিদাতুত ত্বহাবি : ১/৩৯৮

[৮৯] صلاة الاستخارة (সালাতুল ইস্তিখারা)। কোনো বিষয়ে সঠিক সিদ্ধান্ত নেয়ার জন্য আল্লাহ তা'আলার সাহায্য চেয়ে সালাত আদায় করাকে ইস্তিখারার সালাত বলা হয়।

সাহায্য চাইলাম। তিনি যেন আমাকে সহযোগিতা করেন। সঠিক পথ দেখান। আমি বারবার তাঁকে ডাকতে থাকলাম। একসময় আমার মনে হলো, যদি আমাকে আগুনে প্রবেশ করতে হয়, তবে আমি তা-ই করব। এ বিশ্বাস আমার মধ্যে জন্মাল যে, যদি আমি আগুনে প্রবেশ করিও, তবে তা আমার জন্য ঠান্ডা ও নিরাপদ হয়ে যাবে। আগুন ইব্রাহীম ﷺ-এর জন্য যা হয়েছে, [৯০]আমার জন্যও তা-ই হবে।”

পরদিন আবার বিতর্ক শুরু হলো। একসময় প্রতিপক্ষ জোর গলায় দাবি করল, “আমরা আগুনের মধ্যে হাঁটতে পারি।” প্রতিবারই এই ভেল্কি দেখিয়ে তারা পার পেয়েছে। কিন্তু এবার ইবনে তাইমিয়া ﵀-এর জবাব শুনে এরা হতভম্ব হয়ে গেল। ইবনে তাইমিয়া ﵀ বললেন, “আগুনের মধ্যে তো আমিও হাঁটতে পারি। তাহলে এক কাজ করা যাক! আমরা উভয়ই আগুনের মধ্যে দিয়ে হাঁটব। আর যে তা করতে গিয়ে পুড়ে মরবে, তার ওপর যেন আল্লাহ তা‘আলার লানত বর্ষিত হয়।” বিদআতিদের নেতা এ কথা শুনে সাথে সাথেই রাজি হয়ে গেল।

কিন্তু ইবনে তাইমিয়া ﵀ একটি শর্ত জুড়ে দিলেন, “তবে আমার একটি শর্ত আছে। আমরা প্রত্যেকেই নিজের শরীরে গরম পানি আর সিরকা মেখে নেব, ঠিক আছে?” এ শর্ত শুনে প্রতিপক্ষ দ্বিধায় পড়ে গেল। ভয়ে তাদের মুখের রং বদলে গেল। ইবনে তাইমিয়া ﵀ বারবার তাদের উদ্দেশে চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিতে থাকলেন। একসময় এরা লেজ গুটিয়ে পালাল। উপস্থিত দর্শকরা উল্লসিত হয়ে কুরআনের এই আয়াত পড়ল,

فَغُلِبُوا هُنَالِكَ وَانْقَلَبُوا صَاغِرِينَ

---

[৯০] আল্লাহ তা’আলা বলেন,

قَالُوا حَرِّقُوهُ وَانْصُرُوا آلِهَتَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ فَاعِلِينَ

قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ

وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ

“তারা বলল, ‘তাকে আগুনে পুড়িয়ে দাও এবং তোমাদের দেবদেবীদের সাহায্য করো, যদি তোমরা কিছু করতে চাও।’
আমি বললাম, ‘হে আগুন, তুমি শীতল ও নিরাপদ হয়ে যাও ইব্রাহীমের জন্য।’
আর তারা তার বিরুদ্ধে চক্রান্ত করেছিল, কিন্তু আমি তাদের সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত করে দিলাম।” (সূরা আম্বিয়া ২১ : ৬৮-৭০)

"তাই সেখানে তারা পরাজিত হলো এবং লাঞ্ছিত হয়ে গেল।"[৯১]

ইমাম ইবনে তাইমিয়া ﷺ এভাবেই নিজের জীবনকে আল্লাহর কাছে সঁপে দিয়ে তাঁর ওপর ভরসা করেছিলেন। আপনার আল্লাহর ওপর ভরসা কতখানি?

➥ যদি কখনো আপনার মনে এই চিন্তাগুলো খেলে যায় :

❈ সুদি ব্যাংকে চাকরি ছেড়ে দেয়ার পর, "এই একটা চাকরি-ই তো ছিল। এখন কি আর কোথাও চাকরি পাব? এত এত টাকা কই থেকে আসবে? কী খেয়ে বাঁচব?"

❈ "আমি জানি প্রেম করা হারাম। অনেক চেষ্টা করেছি। তাও ছাড়তে পারি না। মেয়েটার চরিত্র যদিও ভালো না। কিন্তু ও তো আমাকে অনেক ভালোবাসে। ওর মতো করে আমাকে আর কে ভালোবাসবে?"

❈ "সিগারেট খাওয়া ঠিক না আমি জানি। কিন্তু অনেক চেষ্টা করেও সিগারেট ছাড়তে পারছি না। কিছুক্ষণ সিগারেট না খেলেই অস্থির লাগা শুরু হয়।"

❈ "পর্দা তো অবশ্যই করা উচিত। কিন্তু বেশিক্ষণ মুখ ঢেকে রাখলে আমার দম বন্ধ হয়ে আসতে চায়। বান্ধবীরা বোরখা পরতে দেখলেই টিটকারি দেয়।"

➥ তাহলে নিজেকে প্রশ্ন করুন :

❈ "আল্লাহর প্রতি আমার ভরসা কি এতটাই কমে গিয়েছে?"

❈ "আল্লাহর জন্য কিছু ত্যাগ করলে তিনি এরচেয়েও উত্তম কিছু আমাকে দান করবেন—আমি কি এ বিশ্বাস রাখতে পারছি না?"

❈ "আমার ঈমান কি এতটাই দুর্বল হয়ে গেছে?"

❈ "দুনিয়ার সামান্য কিছু বিষয়ে আমি যার ওপর ভরসা করতে পারি না, তাঁর কাছ থেকে ভালো কিছু আশা করতে পারি না, তাহলে পরকালে কীভাবে আমি তাঁর কাছ থেকে উত্তম প্রতিদান আশা করি?"

---

[৯১] সূরা আরাফ, ৭ : ১১৯

ইবনে মাসউদ ﵁ বলতেন,

> “আমি আল্লাহর নামে শপথ করে বলছি! কোনো মুমিন যদি আল্লাহর কাছ থেকে সেরাটা আশা না করে, তাহলে সে সেরাটা পাবে না। আল্লাহর শপথ! যে আল্লাহর কাছে সর্বোত্তম আশা করে, আল্লাহ তাকে তার আশানুযায়ী উত্তম কিছু দান করেন। ভালো যা কিছু আছে তা তো রয়েছে আল্লাহর নিকটেই।”[৯২]

তাই জীবনে বিপদ এলে আল্লাহর ওপর ভরসা করুন। তাঁর নিকট আশ্রয় চান। ভুল করে গুনাহ করে ফেললে আল্লাহর কাছে ক্ষমা চান। এ ভরসা রাখুন যে, তিনি আমাদের মাফ করে দেবেন। আল্লাহর কাছ থেকে সেরাটা আশা করার পরেও যদি জীবনে দুঃখ-কষ্ট আসতেই থাকে, তাহলে জেনে নিন, এটা আপনার গুনাহের কারণেই। এর দ্বারা আল্লাহ তা'আলা আপনার কিছু গুনাহ মাফ করে দিচ্ছেন।

আল্লাহ তা'আলা পরম দয়ালু। তিনি ভালোবাসেন আমাদের ক্ষমা করতে। একেবারে তাঁর অবাধ্য না হয়ে গেলে তিনি মানুষকে শাস্তি দেন না। ইবনুল কায়্যিম ﵀ কতই-না সুন্দরভাবে আল্লাহ তা'আলার মহিমার কথা ফুটিয়ে তুলেছেন :

> “তিনি পথভ্রষ্টদের সংশোধন করেন। গাফেলদের অন্তরকে তাঁর দিকে ফিরিয়ে আনেন। গুনাহগারদের তওবা কবুল করেন। যারা ভুল পথে চলে তাদের তিনিই সঠিক পথ দেখান। বিপদগ্রস্তদের রক্ষা করেন। অজ্ঞদের জ্ঞান দান করেন। বিভ্রান্তদের সঠিক পথের সন্ধান দেন। যারা তাঁকে ভুলে যায় তাদের তিনি বারবার মনে করিয়ে দেন। পথহারা পথিকদের আশ্রয় দেন।
>
> “যারা তাঁর বিরুদ্ধাচরণ করতেই থাকে, একগুঁয়ে হয়ে মুখ ফিরিয়ে নেয়—তাদেরকে তিনি বারবার নিজের কাছে ডাকেন। (এরপরেও যদি তারা না শোনে) কেবল তখনই তিনি তাদের শাস্তি দেন।”[৯৩]

---

[৯২] ইবনে আবিদ দুনিয়া : ১/৯৬
[৯৩] ফাওয়াইদ : ১/১৬১

আওয়াব হতে চাইলে

প্রবাদ আছে, “দাঁত থাকতে দাঁতের মর্যাদা নেই।” এটা আরও ভালো বোঝা যায় যখন আমাদের কারও গোড়ালি মচকে যায়, আঙুল বাঁকা হয়ে যায়, আর হাড্ডি ভাঙলে তো কথাই নেই! কোনো কোনো হাড় ভেঙে গেলে আমরা আর চলাফেরাই করতে পারি না। সারাক্ষণ শুয়েবসে কাটাতে হয়। আমরা তখন বুঝতে পারি কী নিয়ামতই না আল্লাহ্ তা‘আলা আমাদের দান করেছেন।

এ নিয়ামতের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে রাসূল ﷺ বলেছেন,

كُلُّ سُلاَمَى مِنَ النَّاسِ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ، كُلَّ يَوْمٍ تَطْلُعُ فِيهِ الشَّمْسُ، يَعْدِلُ بَيْنَ الِاثْنَيْنِ صَدَقَةٌ، وَيُعِينُ الرَّجُلَ عَلَى دَابَّتِهِ فَيَحْمِلُ عَلَيْهَا، أَوْ يَرْفَعُ عَلَيْهَا مَتَاعَهُ صَدَقَةٌ، وَالكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ خُطْوَةٍ يَخْطُوهَا إِلَى الصَّلاَةِ صَدَقَةٌ، وَيُمِيطُ الأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ صَدَقَةٌ

“প্রতিদিন সূর্য ওঠার পর মানুষের প্রত্যেক গ্রন্থির জন্য সদকা রয়েছে। দুজন মানুষের মধ্যে মীমাংসা করে দেয়া সদকা। মানুষকে নিজ বাহনের ওপর বসানো, তার মালামাল উঠিয়ে দিয়ে সাহায্য করাও সদকা। ভালো কথা বলা সদকা। সদকা রয়েছে সালাতের জন্য প্রতিটি কদম ফেলার মধ্যে। রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক জিনিস সরিয়ে ফেলাও সদকাহ্।”[৯৪]

প্রতিদিন আমাদের ওপর কী পরিমাণ সদকা রয়েছে তা জানতে প্রথমে জানা প্রয়োজন আমাদের শরীরে কয়টি গ্রন্থি রয়েছে। রাসূল ﷺ জানিয়েছেন, আমাদের

[৯৪] সহীহ বুখারি, হাদিস নং : ২৯৮৯

শরীরে ৩৬০টি গ্রন্থি রয়েছে।[৯৫] তাই যে প্রতিদিন ৩৬০টি সদকা আদায় করতে পারবে সে,

فَإِنَّهُ يُمْسِي يَوْمَئِذٍ وقَدْ زَحْزَحَ نَفسَهُ عَنِ النَّارِ

"সেদিনের মতো নিজেকে জাহান্নাম থেকে দূরে সরিয়ে ফেলল।"[৯৬]

কিন্তু এটা তো ভয়াবহ চিন্তার ব্যাপার। প্রতিদিন ৩৬০টি সদকা! কোনোদিন কষ্ট করে আমরা এটি আদায় করতে পারলেও আরেকদিন দেখা যাবে তা আর পারলাম না। আখিরাতে আল্লাহ তা'আলা যদি এই নিয়ামত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেন তবে কী জবাব দেবো?

এখনই হতাশ হয়ে যাবেন না। আলহামদুলিল্লাহ। বাঁচার অনেকগুলো উপায় আছে। তার মধ্যে একটি হচ্ছে,

وَيُجْزِئُ مِنْ ذَلِكَ رَكْعَتَانِ يَرْكَعُهُمَا مِنَ الضُّحَى

"আর দুই রাকাত দুহার সালাত এ সবকিছু মিটিয়ে দেয়।"[৯৭]

যারা এতক্ষণ, কীভাবে প্রতিদিন ৩৬০টি সদকা করবেন তা নিয়ে আকাশ-কুসুম চিন্তা করছিলেন, তারা আশা করি খুব যত্নের সাথে এখন থেকে দুহার সালাত আদায় করবেন।

দুহার সালাত কয় রাকাত পড়বেন?

আয়েশা ﵂-কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল রাসূল ﷺ কত রাকাত দুহার সালাত পড়তেন। উনি উত্তরে বলেছিলেন,

أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ وَيَزِيدُ مَا شَاءَ

[৯৫] সহীহ মুসলিম, হাদিস নং : ১০০৭
[৯৬] ইবনে হিব্বান, হাদিস নং : ৩৩৮০
[৯৭] সহীহ মুসলিম, হাদিস নং : ৭২০

"চার রাকাত। তবে ইচ্ছা হলে বেশিও পড়তেন।"[৯৮]

তবে রাসূল ﷺ থেকে দুই রাকাত সালাত আদায় করার নির্দেশনা পাওয়া যায়। যা একটু আগেই উল্লেখ করা হয়েছে।[৯৯] এ ছাড়া আবু হুরাইরা رضي الله عنه বলেছেন,

➡ "আমার বন্ধু ﷺ আমাকে তিনটি কাজ করতে উপদেশ দিয়েছেন :

- প্রতিমাসে তিন দিন সিয়াম পালন করা।
- দুই রাকাত দুহার সালাত আদায় করা।
- আর ঘুমাতে যাওয়ার আগে বিতরের সালাত আদায় করা।"[১০০]

দুহার সালাতের সময় কখন থেকে?

শায়খ ইবনে উসাইমিন رحمه الله দুহার সালাতের সময় উল্লেখ করেছেন, সূর্যোদয়ের পনেরো মিনিট পর থেকে যোহরের সালাতের দশ মিনিট আগ পর্যন্ত।[১০১]

সূর্যের তাপ কিছুটা কড়া হবার পর দুহার সালাত পড়া ভালো। রাসূল ﷺ বলেছেন,

صَلاَةُ الأَوَّابِينَ حِينَ تَرْمَضُ الْفِصَالُ

"আল্লাহর দিকে ধাবিতদের সালাতের সময় হয় যখন উট শাবকের পায়ে গরম সেকা লাগার সময় হয়ে থাকে।"[১০২]

দুহার সালাতের সময় শুনে হয়তো অনেকের উৎসাহে ভাটা পড়ে গেছে। সে সময়ে তো আমরা ক্লাস, অফিস, ব্যবসা—এসবে প্রচণ্ড ব্যস্ত থাকি। এ সময় সালাত আদায় করা খুবই কঠিন।

---

[৯৮] সহীহ মুসলিম, হাদিস নং : ৭১৯
[৯৯] সহীহ মুসলিম, হাদিস নং : ৭২০
[১০০] সহীহ বুখারি, হাদিস নং : ১৯৮১
[১০১] শরহুল মুমতি : ৪/১২২
[১০২] সহীহ মুসলিম, হাদিস নং : ৭৪৮

ঠিক এ কারণেই রাসূল ﷺ বলেছেন,

لَا يُحَافِظُ عَلَى صَلَاةِ الضُّحَى إِلَّا أَوَّابٌ

"একমাত্র আওয়াবই যত্ন করে দুহার সালাত পড়ে।"[১০৩]

'আওয়াব' হচ্ছে একটি প্রশংসনীয় গুণ। এটি দিয়ে এমন কাউকে বোঝানো হয়, যে সব সময় আল্লাহর কাছে তওবা করে ফিরে যায়। আল্লাহ তা'আলা আইয়্যুব ﷵ-এর কথা কুরআনে এভাবে উল্লেখ করেছেন,

إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ

"নিশ্চয়ই আমি তাকে ধৈর্যশীল পেয়েছি। সে কতই-না উত্তম বান্দা! সত্যিই সে ছিল আমার অভিমুখী (আওয়াব)।"[১০৪]

মহান আল্লাহ তা'আলা আমাদের তাদের একজন করুন যাদের কাছে জান্নাতকে আনা হবে। যাদের সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ

هَٰذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ

"যারা আল্লাহকে ভয় করে তাদের জন্য জান্নাতকে নিকটে আনা হবে, তা মোটেই দূরে থাকবে না। এরই প্রতিশ্রুতি তোমাদের দেয়া হয়েছিল—প্রত্যেক আওয়াব, হিফাযাতকারীর জন্য।"[১০৫]

---

[১০৩] মুসতাদরাক হাকিম, হাদিস নং : ১১৮২
[১০৪] সূরা সোয়াদ, ৩৮ : ৪৪
[১০৫] সূরা কাফ, ৫০ : ৩১-৩২

আগে একটু ঠান্ডা হতে দিন

ক্লান্ত দিন শেষে বাড়ি ফিরছেন। ক্ষুধার জ্বালায় কাহিল। এমন সময় আগুনগরম ভাতের সাথে যেকোনো কিছুই আমরা গপ গপ করে খেয়ে ফেলতে পারি। ফুঁ দিয়ে, জিভ পুড়িয়ে, হাতে গরম ছ্যাকা খেয়ে এভাবে গরম খাবার খেতে আমরা কেন যেন খুব উপভোগ করি।

তবে আমরা হয়তো জেনে অবাক হব, এভাবে আগুনগরম খাবার কষ্ট করে খাওয়া রাসূল ﷺ-এর সুন্নাহর একদম বিপরীত।[১০৬] যখন আবু বকর رضي الله عنه-এর কন্যা আসমা رضي الله عنها সারিদ[১০৭] তৈরি করতেন, তিনি তা ঢেকে দিতেন যেন খাবারের ধোঁয়া প্রশমিত হয়ে যায়। তিনি বলতেন,

---

[১০৬] দুঃখজনকভাবে, খাবারের ক্ষেত্রে রাসূল ﷺ যে সুন্নাহ অনুসরণ করেছেন, তার উল্টোটা করাই যেন আমরা নিজেদের জন্য দায়িত্ব বানিয়ে ফেলেছি।

❊ রাসূল ﷺ আমাদের বাম হাত দিয়ে খাবার খেতে নিষেধ করে বলেছেন, "তোমাদের কেউ যখন আহার করে, তখন সে যেন ডান হাতে খায়। আর যখন পান করে সে যেন ডান হাতে পান করে। কারণ, শয়তান বাম হাতে আহার করে এবং বাম হাতে পান করে।" (সহীহ মুসলিম, হাদিস নং : ২০২০) অথচ বাম হাতে খাবার খাওয়াকে আমরা তেমন খারাপভাবে দেখি না।

❊ একসাথে খেতে বসলে রাসূল ﷺ নিজের দিক থেকে খাবার খাওয়া শুরু করতে বলছেন। অথচ আমরা দেখি কার কার দিকে ভালো খাবার আছে। সেখান থেকেই ছোঁ দিয়ে খাবার খাওয়া শুরু করি। রাসূল ﷺ একবার এক বালককে বলেছিলেন, "ছেলে! বিসমিল্লাহ বলে ডান হাতে আহার করো এবং তোমার কাছ থেকে খাও।" (সহীহ বুখারি, হাদিস নং : ৫৩৭৬)

❊ হেলান দিয়ে খাবার খাওয়া আমাদের আরেকটি বদ-অভ্যাস। অথচ রাসূল ﷺ বলতেন, "হেলান দেয়া অবস্থায় আমি আহার করি না।" (সহীহ বুখারি, হাদিস নং : ৫৩৯৯)

❊ কোথাও খেতে গেলে কিছু অংশ উচ্ছিষ্ট রেখে দেয়াকে আমরা ভদ্রতা মনে করি। অথচ রাসূল ﷺ খাবার ফেলে না রেখে চেটে চেটে খেতেন। আনাস رضي الله عنه থেকে বর্ণিত, "রাসূল ﷺ যখন কোনো খাবার খেতেন তখন তাঁর আঙুল তিনটি চেটে নিতেন এবং তিনি বলতেন, 'যদি তোমাদের কারও লোকমা পড়ে যায় তবে সে যেন তা থেকে ময়লা দূর করে এর খাদ্যটুকু খেয়ে ফেলে। শয়তানের জন্য যেন তা রেখে না দেয়।' আর তিনি আমাদের বাসন মুছে খেতে আদেশ দিয়েছেন এবং বলেছেন, 'তোমরা তো জানো না, খাবারের কোন অংশে বরকত আছে।'" (সহীহ মুসলিম, হাদিস নং : ২০৩৪)

[১০৭] الثَّرِيد (সারিদ)। মাংসের ঝোলে ভিজিয়ে বানানো রুটি। রাসূল ﷺ এ খাবারটি খুব পছন্দ করতেন।

إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : إنه أعظم للبركة

“আমি রাসূল ﷺ-কে বলতে শুনেছি, ‘এমনটা করলে বারাকাহ বেড়ে যায়’।”[১০৮]

আবু হুরাইরা رضي الله عنه বলতেন,

لا يؤكل طعام حتى يذهب بخاره

“ধোঁয়া না প্রশমিত হওয়া পর্যন্ত খাবার খাওয়া উচিত না।”[১০৯]

এরপর থেকে ধোঁয়া ওঠা খাবার খেতে গিয়ে নিজের জামা নোংরা না করে, কার্পেটের বারোটা না বাজিয়ে আর জিহ্বা না পুড়িয়ে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করুন।

মানুষ রেগে গিয়ে গরম হয়ে গেলে সে ঠান্ডা না হওয়া পর্যন্ত আমরা তার সাথে কথা বলি না। কারণ, রাগান্বিত অবস্থায় তাকে কিছু বোঝাতে গেলে উপকারের চেয়ে ক্ষতিই বেশি হবে। খাবারের ক্ষেত্রেও একই কথা। ঠান্ডা অবস্থাতেই খাবার আমাদের জন্য বেশি উপকারী।

---

[১০৮] ইবনে হিব্বান, হাদিস নং : ৫২০৭

[১০৯] বায়হাকি, হাদিস নং : ৪২৮

ভয় পেলে

ভয় কে না পায়?

মাঝে মাঝে ভয় পাওয়া দরকার। ভয় না পেলে আমরা বিপদের অস্তিত্ব টেরই পেতাম না। বেখেয়ালে নিজের জীবনে ধ্বংস ডেকে আনতাম। তবে মাত্রাতিরিক্ত ভয় পেলে স্বাভাবিক জীবনযাপন করাই কষ্টকর হয়ে পড়ে। তাই মাত্রাতিরিক্ত ভয় থেকে নিজেকে রক্ষা করা জরুরি। আর তা করতে একটি সুন্নাহ রাসূল ﷺ আমাদের শিখিয়েছেন।

উকবাহ ইবনে আমির رضي الله عنه বলেন,

> "জুহফা এবং আবওয়ার মধ্যকার একটি জায়গায় আমি রাসূল ﷺ-এর সাথে ভ্রমণ করছিলাম। হঠাৎ করে আমরা নিজেদের ঝড়ো বাতাস এবং গাঢ় অন্ধকারের মধ্যে আবিষ্কার করলাম। রাসূল ﷺ সূরা ফালাক্ব এবং সূরা নাস পড়া শুরু করলেন।

আর আমাকে বললেন,

يَا عُقْبَةُ، تَعَوَّذْ بِهِمَا فَمَا تَعَوَّذَ مُتَعَوِّذٌ بِمِثْلِهِمَا

> "উকবা! এ দুইটি সূরা পড়ে সুরক্ষা চাও। কেননা, আশ্রয় প্রার্থনা করার জন্য এ দুইটি সূরার চেয়ে আর কোনো কিছুই উত্তম হতে পারে না।"[১১০]

---

[১১০] সুনানে আবু দাউদ, হাদিস নং : ১৪৬৩

ছোটবেলায় আমরা অনেকেই হয়তো সূরা ফাতিহার পর এই দুইটি সূরা মুখস্থ করেছি সালাত আদায়ের জন্য। অথচ আমরা নিজেরাও জানি না, এ দুইটি সূরা আমাদের জীবনে কতই-না দরকারি! রাসূল ﷺ রাতের বেলায় ঘুমাতে যাওয়ার আগে এ সূরা দুইটি পড়তেন।[১১১]

এ দুটি সূরা সম্পর্কে ইমাম ইবনুল কায়্যিম ؒ বলেন,

> "এতক্ষণ আলোচনার উদ্দেশ্য ছিল, সবাইকে এই দুইটি সূরার গুরুত্ব বোঝানো। আমাদের প্রতিদিনের জীবনে এই দুইটি সূরার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করানো। এটার গুরুত্ব এতটাই বেশি যে, এই দুইটি সূরা ছাড়া ভালোভাবে বেঁচে থাকা অসম্ভব। জাদু দূর করতে, বদনজর থেকে, সকল প্রকার অনিষ্ট থেকে রক্ষা করতে এদের জুড়ি নেই। বাতাস, খাবার, পানি এমনকি পোশাকের চেয়েও সবার এই দুইটি সূরা বেশি প্রয়োজন।"[১১২]

চেষ্টা করুন, এই দুইটি সূরার প্রয়োজনীয়তা সব সময় মাথায় রাখতে। সূরা দুটি অন্তরে ও জবানে সব সময় ধারণ করতে।

প্রচণ্ড ভয়ের সময়, দুঃশ্চিন্তার সময় এই দুইটি সূরা পড়ে আল্লাহর কাছে সাহায্য চান। তিনি যদি আমাদের রক্ষা করেন, তবে কারও কি ক্ষমতা আছে আমাদের কোনো ক্ষতি করার?

---

[১১১] আয়েশা ؓ থেকে বর্ণিত, "রাসূল ﷺ প্রতিরাতে শোয়ার জন্য তাঁর বিছানায় এসে দুহাত একত্র করে সূরা ইখলাস, সূরা নাস ও সূরা ফালাক্ব পড়ে (হাতে) ফুঁক দিতেন। তারপর সেই হাত পুরো শরীরে বোলাতেন। তিনি মাথা থেকে শুরু করতেন, তারপর মুখমণ্ডল, শরীরের সম্মুখভাগ, এরপর শরীরের যেখানে যেখানে হাত পৌঁছানো সম্ভব। তিনি এরূপ তিনবার করতেন।" (সহীহ বুখারি, হাদিস নং : ৫০১৭)

[১১২] বাদায়িউল ফাওয়াইদ : ২/১৯৯

যে ঋণ জান্নাতে নিয়ে যায়

বেশি বেশি সওয়াব অর্জন করতে চাইলে ইবাদতের কোনো বিকল্প নেই। ইবাদত বলতে আমাদের মাথায় সবার প্রথমে আসে সালাত পড়া, সিয়াম পালন করা, কুরআন তিলওয়াত করা। সন্দেহ নেই, এসব খুবই মর্যাদাময় ইবাদত। তবে আরও কিছু কাজ আছে, যেগুলো করলে আল্লাহ তা‘আলা নিজেই সে আমল বহুগুণে বাড়িয়ে দেন। তেমনই একটি কাজ হচ্ছে, মানুষকে সুদমুক্ত ঋণ দেয়া। আবু দারদা رضي الله عنه বলেন,

لَأَنْ أُقْرِضَ رَجُلًا دِينَارَيْنِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِهِمَا

“কাউকে দুই দিনার ঋণ দেয়া আমার কাছে এ দুটি দিনার কাউকে সদকা হিসেবে দিয়ে দেয়ার চেয়েও বেশি প্রিয়।”[১১৩]

অনেকে হয়তো ভাবছেন, যদি সে আমাকে ঋণ ফেরত দিতে না পারে? মজার ব্যাপার, দুনিয়া যখন তার দুয়ার আমাদের জন্য বন্ধ করে দেয়, তখন আল্লাহ তা‘আলা আমাদের জন্য তাঁর অসীম ভান্ডার উন্মুক্ত করেন। যাকে ঋণ দেয়া হয়েছে, সে যদি তা ফেরত দিতে দেরি করে তখন আল্লাহ তা‘আলা আমাদের জন্য সে ঋণের সওয়াব বহুগুণে ফিরিয়ে দেন।

---

[১১৩] ইবনে আবি শাইবা, হাদিস নং : ২২৬৮২

রাসূল ﷺ বলেছেন,

من أنظرَ معْسِرًا فله بكلِّ يومٍ مثلَهُ صدَقَةٌ [..] قبلَ أنْ يحلَّ الدَّيْنُ فإذا حلَّ الدَّيْنُ فأنظرَهُ فلَهُ بكلِّ يومٍ مثلَيْهِ صدقَةً

“নির্দিষ্ট সময়ে পুরো ঋণ ফিরিয়ে দিতে হিমশিম খাচ্ছে এমন ঋণগ্রস্ত ব্যক্তিকে যে দেনা ফিরিয়ে দেয়ার জন্য সময় দেয়, ওই ব্যক্তিকে এমন সওয়াব দেয়া হবে যেন সে প্রতিদিনই সমপরিমাণ টাকা সদকা করেছে। আর যে সময় চলে যাওয়ার পরেও ঋণগ্রস্ত ব্যক্তিকে আরও সময় দেয়, তাকে অতিক্রম হওয়া প্রতিদিনের জন্য এমন সওয়াব দেয়া হবে, যেন সে প্রতিদিন ধার দেয়া টাকার চেয়ে দ্বিগুণ পরিমাণ টাকা সদকা করেছে।”[১১৪]

এ হাদিসে যে কী বিশাল সওয়াবের কথা বলা হয়েছে তা হয়তো অনেকেই ধরতে পারেননি।

➡ একটা উদাহারণ দিয়ে বুঝিয়ে দিচ্ছি :

ধরা যাক, খালিদ করিমকে ২,০০০ টাকা ধার দিলো জানুয়ারি মাসের ১ তারিখে। তারা একমত হলো যে, জুলাই মাসের ১ তারিখে করিম সে টাকা ফেরত পাবে। তাহলে খালিদ এ ছয় মাসে কত টাকা সদকা দেয়ার সওয়াব পেল? এটা বের করতে রকেট সায়েন্টিস্ট হবার প্রয়োজন নেই।

৬ মাসে ১৮০ দিন। ওপরের হাদিস অনুযায়ী, খালিদ প্রতিদিনই ২,০০০ টাকা করে সদকা দেয়ার সওয়াব পাচ্ছে। তাহলে, ৬ মাসে সে পাচ্ছে (১৮০×২,০০০) তিন লক্ষ ষাট হাজার টাকা সদকা করার সওয়াব।

কিন্তু কোনো কারণে করিম সে টাকা ৬ মাস পর ফেরত দিতে পারল না। তাহলে, এরপরের প্রতিদিনের জন্য খালিদ পাচ্ছে (দুই হাজার টাকার দ্বিগুণ) ৪,০০০ টাকা সদকা করার সওয়াব। যদি আরও ৬ মাস পর করিম টাকা ফেরত দেয় তাহলে খালিদ এ ৬ মাসে আরও (১৮০×৪,০০০) সাত লক্ষ বিশ হাজার টাকা সদকা করার সওয়াব পেয়ে গেল।

---

[১১৪] মুসনাদে আহমাদ, হাদিস নং : ২৩০৪৬

খালিদ কিন্তু করিমকে দিয়েছিল মাত্র ২,০০০ টাকা। দুনিয়ার হিসাব অনুযায়ী, তার ২,০০০ টাকার পুরস্কারই পাওয়া উচিত। কিন্তু ইসলামে সে পাচ্ছে (৩,৬০,০০০+৭,২০,০০০) সর্বমোট দশ লক্ষ আশি হাজার টাকা সদকা করার সওয়াব।

একজন মধ্যবিত্ত মানুষ হয়তো সারাজীবনেও এত টাকা সদকা করতে পারবে না। কিন্তু তার ভাইকে ঋণ দেয়ার মাধ্যমে সে সহজেই সমপরিমাণ টাকা সদকা করার সওয়াব পেতে পারে।

وَاللَّـهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ

"আর আল্লাহ যাকে ইচ্ছা করেন, তার জন্য বাড়িয়ে দেন।"[১১৫]

[১১৫] সূরা বাকারা, ২ : ২৬১

যে ভয় তাদের তাড়িয়ে বেড়িয়েছে

সময় বদলে গেছে। তাই মানুষও বদলে গেছে। বদলে গেছে সবার চিন্তা-ভাবনা। অনেক কিছুর মানদণ্ডই আর আগের মতো নেই।

একসময় যা আমাদের সালাফদের জন্য ছিল মূর্তিমান আতঙ্ক, আজ বহু মানুষ সে জিনিসের পিছনেই ছুটছে। সেটাকেই জীবনের একমাত্র সফলতা মনে করছে। যেটার কথা মনে হলে তাদের মন বিষাদে ছেয়ে যেত, আজ অনেকের মন সেটার জন্য আকুল হয়ে আছে। কী সেটা?

খ্যাতি। মানুষের প্রশংসা পাওয়া। সবার মুখে মুখে নিজের নাম ছড়িয়ে পড়া।

তবে যাদের মনটা আখিরাতের সাথে জুড়ে ছিল, তারা কখনো এ দুনিয়ার সস্তা সুনাম চাননি। মানুষের মুখে বাহবা না পেলে তারা মন খারাপ করতেন না। কারণ, তারা আল্লাহর জন্য কাজ করতেন। তাঁর কাছেই প্রতিদান চাইতেন।

তাই তারা খ্যাতি থেকে পালিয়ে বেড়াতেন। লেমলাইটে নয়, বরং পর্দার অন্তরালে থেকেই কাজ করতে ভালোবাসতেন। সামান্য আত্মতুষ্টি তাদের ভালো আমলগুলোকে নষ্ট করে দেয় কিনা, এ ভয় তাদের সব সময় তটস্থ করে রাখত।

ইবনে মুহাইরীয ﵀ এই বলে আল্লাহর নিকট দু'আ করতেন,

اللّٰهُمَّ إني أسألك ذكراً خاملاً

"হে আল্লাহ, আমি আপনার কাছে চাই (সবার নিকট যেন আমার) বেশি সুনাম না থাকে।"[১১৬]

তারা পাদপ্রদীপের আলো থেকে দূরে থাকতে চাইতেন। বারবার আল্লাহর নিকট মানুষের সুনাম থেকে আশ্রয় চাইতেন। তারা চাইতেন, মানুষের নিকট অপরিচিত হয়ে বাঁচতে। অতি সাধারণ একজন হিসেবেই জীবনটা কাটিয়ে দিতে। সামান্য কিছু খাবার খেয়ে জীবনধারণ করতে। একজন দাস যেভাবে মাটিতে বসে, সেভাবেই বসতে।

সাহাবি আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ ﵁ একদিন বাসার বাইরে বের হলেন। মানুষজন তার চারদিকে ভিড় করা শুরু করলে উনি তাদের দিকে ফিরে বললেন,

علامَ تتبعوني؟ والله لو تعلمون ما أغلق عليه بابي ما تبعني منكم رجلان

"তোমরা আমার পিছে পিছে আসছ কেন? তোমরা যদি বন্ধ দরজার ভেতরে আমার আসল অবস্থা জানতে, আল্লাহর কসম! তোমাদের মধ্যে দুইজনও আমাকে অনুসরণ করতে না।"[১১৭]

ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল ﵀-এর কথা কে না জানে! কিংবদন্তি আলেম। সবার প্রিয় ইমাম। তার চাচা একদিন তাকে দেখতে আসলেন। সে সময়ে আহমাদ ইবনে হাম্বল ﵀-এর খ্যাতি চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছে। সবাই তাকে এক নামে চেনে। এমন একজন জ্ঞানী ব্যক্তির সময়ে থাকতে পেরে সবাই খুশি। কিন্তু আহমাদ ইবনে হাম্বল ﵀ কতটুকু খুশি ছিলেন? তার চাচা দেখতে পেলেন, আহমাদ ইবনে হাম্বল ﵀ খুবই অস্থির সময় কাটাচ্ছেন। দুহাত দিয়ে মুখ ঢেকে আছেন। তিনি আহমাদ ইবনে হাম্বল ﵀-কে এত অস্থিরতার কারণ জিজ্ঞেস করলেন। আহমাদ ইবনে হাম্বল ﵀ তখন মাথা তুলে বললেন,

"চাচা! যাদের খ্যাতি কম, তারা কতই-না ভালো আছে!"[১১৮]

তাকে আরও বলতে শোনা যেত—"আমি চাই মক্কার নির্জন কোনো উপত্যকায় থাকতে। যেখানে কেউ আমাকে চিনবে না। খ্যাতি আমাকে খুব কষ্ট দিচ্ছে। প্রত্যেক

[১১৬] তাফসীর ইবনে কাসির : ৬/৩৪২
[১১৭] আরশি'ফু মুলতাকা আহলিল হাদিস : ৫, ২০/১৫৪
[১১৮] তারিখে দিমাশক ইবনে আসাকির : ৫/৩০৯

সকালে-সন্ধ্যায় আমি নিজের মৃত্যু কামনা[১১৯] করি।”[১২০]

ইব্রাহিম ইবন আদহাম ﷺ বলতেন, “যে খ্যাতি কামনা করে, সে আসলে আল্লাহর প্রতি আন্তরিক নয়।”[১২১]

যখন আইয়্যুব আস সিখতিয়ানি ﷺ কোনো মজলিসের পাশ দিয়ে যেতেন, তাদের সালাম দিতেন। সবাই তাকে চিনতে পেরে উচ্ছ্বাসের সাথে সালামের উত্তর নিত। এটা দেখে তিনি আফসোস করে বলতেন,

كأن ذلك نقمة، كأن ذلك نقمة

“যেন আমাকে শাস্তি দেয়া হচ্ছে। যেন আমাকে শাস্তি দেয়া হচ্ছে।”

তিনি বলতেন, “আমার ভয় হয় খ্যাতির কারণে শেষ পর্যন্ত আল্লাহর কাছে আমাদের কোনো ভালো আমলই থাকবে না।”[১২২]

তারা ভিআইপি টিকেট চাইতেন না। আলাদা প্রটোকল কামনা করতেন না। এমন মানুষ হয়তো আমাদের সময়েও রয়েছেন। তাদের কয়জন ফলোয়ার হলো, স্ট্যাটাসে কয়টা লাইক পড়ল, এটা নিয়ে তাদের মাথাব্যথা নেই। তারা শুধু আল্লাহর জন্য কাজ করে যান। কে কী বলল, সমালোচনা করল না প্রশংসা করল, তা নিয়ে

---

[১১৯] দুনিয়াবি কারণে রাসূল ﷺ আমাদের মৃত্যু কামনা করতে নিষেধ করেছেন। রাসূল ﷺ বলেন, “তোমাদের মধ্যে কেউ যেন মৃত্যু আসার আগেই তা কামনা না করে কিংবা মৃত্যু প্রার্থনা করে দু'আ না করে। কারণ, তোমাদের মধ্যে যখন কেউ মারা যায়, তখন তার ভালো আমলগুলো বন্ধ হয়ে যায়। আর মুমিনদের দীর্ঘ জীবন তো তার ভালো কাজ আরও বাড়িয়ে দেয়।” (সহীহ মুসলিম, হাদিস নং : ২৬৮২)
তবে ফিতনার আশঙ্কা থাকলে সাধারণভাবে মৃত্যু কামনা করার অনুমতি রয়েছে। রাসূল ﷺ এই বলে আল্লাহর নিকট দু'আ করতেন,

اللَّهُمَّ أَحْيِنِي مَا كَانَتِ الْحَيَاةُ خَيْرًا لِي، وَتَوَفَّنِي إِذَا كَانَتِ الْوَفَاةُ خَيْرًا لِي

“হে আল্লাহ, আমাকে বাঁচিয়ে রাখুন যতক্ষণ বেঁচে থাকাই আমার জন্য ভালো। আর আমায় মৃত্যু দান করুন, যখন মৃত্যুই আমার জন্য উত্তম।” (ইবনে আবি শাইবা, হাদিস নং : ২৯৩৪৭)
তিনি আরও দু'আ করতেন,

وَإِذَا أَرَدْتَ بِعِبَادِكَ فِتْنَةً فَاقْبِضْنِي إِلَيْكَ غَيْرَ مَفْتُونٍ

“আর যদি আপনি আপনার বান্দার জন্য ফিতনা নির্ধারণ করেই রাখেন, তবে ফিতনা আসার আগেই আমাকে আপনার কাছে নিয়ে যান।” (তিরমিযী, হাদিস নং : ৩২৩৩)
আর আল্লাহর রাস্তায় শাহাদাত কামনা করা শুধু বৈধই নয়; বরং পছন্দনীয়। রাসূল ﷺ বলেন, “যে আন্তরিকভাবে আল্লাহর নিকট শাহাদাত কামনা করবে, আল্লাহ তাকে শহীদের মর্যাদা দান করবেন; এমনকি সে যদি তার বিছানায় মারা যায় তবুও।” (সহীহ মুসলিম, হাদিস নং : ১৯০৯)

[১২০] সিয়ারু আলামিন নুবালা : ১১/২১৬

[১২১] সিয়ারু আলামিন নুবালা : ৭/৩৯৩

[১২২] তাওয়াদূ'য়ু খুমুল লি ইবনে আবিদ দুনিয়া হাদিস নং : ৫৬

তাদের ভ্রুক্ষেপ করার সময় নেই।

বহু মানুষের নিকট খ্যাতির চেয়ে মিষ্টি আর কিছুই হতে পারে না। তবে আমাদের সালাফদের নিকট খ্যাতির স্বাদ ছিল অতিমাত্রায় তেতো। খালিদ ইবনে মা'দান ﵀ এর ক্লাসে যখন ছাত্রসংখ্যা বেড়ে যেত, তখন তিনি খ্যাতির ভয়ে ক্লাস থেকে বের হয়ে যেতেন। একই কারণে আবুল আলিয়া ﵀-এর হালাকায় ছাত্রসংখ্যা তিনের বেশি হলেই তিনি উঠে চলে যেতেন।

আবু বকর ইবনে 'আইয়াশ ﵀-কে একবার জিজ্ঞেস করা হয়েছিল,

> "ইব্রাহীম আন নাখা'য়ী ﵀-এর ক্লাসে আপনি সর্বোচ্চ কতজন ছাত্রকে দেখেছিলেন? তিনি বললেন, 'সর্বোচ্চ চার কী পাঁচজনকে।"[১২৩]

আমাদের সময়ে কোনো আলেম দূরে থাকুন, কোনো পাবলিক স্পিকারও কি দশ-বিশজনের মজলিসে আসবেন? আর যদি আসার পর কাউকেই না পান, তবে তারা কেমন রেগে যাবেন ভাবা যায়?

সংখ্যা দিয়ে কি ভালো কাজ মাপা যায়? একজন মানুষের অনেক ফলোয়ার থাকতে পারে। হতে পারে তার কথা বহু মানুষ শোনে। কিন্তু সে কথা তাদের জীবন বদলে দেয় না। আবার আরেকজনের কথা হয়তো সামান্য কিছু মানুষ শোনে, কিন্তু সে কথা তাদের নতুনভাবে ভাবতে শেখায়। অন্তরটাকে আল্লাহর স্মরণে বিগলিত করে দেয়। মুখ দিয়ে আসা কথা তো কান পর্যন্ত পৌঁছায়। কিন্তু যে কথা অন্তর থেকে আসে, তা অন্তরেই পৌঁছায়।

আপনাকে ফলো করে এমন মানুষ কি খুবই কম?

তাহলে আল্লাহ তা'আলাকে ধন্যবাদ দিন। কারণ, এখন আপনার ভুলগুলো বেশি মানুষের কাছে পৌঁছাচ্ছে না। মানুষের দিকে না তাকিয়ে আপনার পক্ষে আল্লাহর দিকে ফোকাস করা সহজ। আপনার মনে অহংকার দানা বাঁধার সম্ভাবনা কম। নিজেকে বড় ভাবার সম্ভাবনা ক্ষীণ।

---

[১২৩] মুখতাসার সিফাতিস সাফওয়া লি ইবনিল জাওযী, পৃষ্ঠা : ১৬৭

রাসূল ﷺ বলেছেন,

طُوبَى لِعَبْدٍ آخِذٍ بِعِنَانِ فَرَسِهِ فِي سَبِيلِ اللَّـهِ أَشْعَثَ رَأْسُهُ مُغْبَرَّةٍ قَدَمَاهُ إِنْ كَانَ فِي الْحِرَاسَةِ كَانَ فِي الْحِرَاسَةِ وَإِنْ كَانَ فِي السَّاقَةِ كَانَ فِي السَّاقَةِ إِنْ اسْتَأْذَنَ لَمْ يُؤْذَنْ لَهُ وَإِنْ شَفَعَ لَمْ يُشَفَّعْ

"ওই ব্যক্তির জন্য সুসংবাদ যে ঘোড়ার লাগাম ধরে আল্লাহর পথে প্রস্তুত রয়েছে। তার চুল এলোমেলো, পা ধূলিময়। তাকে পাহারায় রাখা হলেও সে সন্তুষ্ট, আবার একদম পেছনের কাতারে রাখা হলেও সে খুশি। সে কারও সাক্ষাতের অনুমতি চাইলে তাকে অনুমতি দেয়া হয় না এবং কোনো বিষয়ে সুপারিশ করলে তার সুপারিশ গ্রহণ করা হয় না।"[১২৪]

আজও বহু মানুষ মানুষকে আল্লাহর পথে ডাকছে। আল্লাহর পথে সংগ্রাম করছে। তাদের মধ্যে কজন খ্যাতি থেকে দূরে থাকতে চান? সবার চোখ ধাঁধিয়ে নয়, বরং পর্দার অন্তরালে নীরবে কাজ করে নিজের জীবনটাকে ইসলামের জন্য বিলিয়ে দিতে চান?

যে পথে আমাদের দুনিয়াবিমুখ সালাফরা হেঁটেছেন, সে নীরস পথে হাঁটতে আমরা কজন রাজি আছি?[১২৫]

---

[১২৪] সহীহ বুখারি, হাদিস নং : ২৮৮৬

[১২৫] তবে বিষয়টি নিয়তের সাথে সম্পৃক্ত। যাদের উদ্দেশ্য হবে বেশি মানুষকে উপকৃত করা, তাদের কথা এখানে বলা উদ্দেশ্য নয়।–শার'ঈ সম্পাদক

সব্যসাচী?

মক্কায় একবার খুব অদ্ভুত একটি দৃশ্য দেখা গিয়েছিল। খুব সিরিয়াস মুখে একজন মানুষ দুইটা ছেলের কথা শুনছে। কাছে এসে সবাই বুঝতে পারল, ছেলে দুটি তাকে বিভিন্ন ইসলামিক উদ্ধৃতি মুখস্থ শোনাচ্ছে আর তিনি তাদের শুধরে দিচ্ছেন।

অবাক করা বিষয় হচ্ছে, ছেলে দুইটি কিন্তু আলাদা আলাদা বিষয় পড়ে শোনাচ্ছে। কিন্তু তারপরেও তিনি একইসাথে তাদের কথা শুনতে পারছেন। ভুল হলে শুধরে দিতে পারছেন। উনার এই গুণে সবাই মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিল।

মুগ্ধ হবার কারণ হচ্ছে, এমনটা করতে পারা সহজ কিছু না। অনেক আধুনিক নিউরোসায়েন্টিস্টের মতে, আমাদের মস্তিষ্কের গঠনই এমন যে, সেটা অনেক কাজ একসাথে ভালোভাবে করতে পাতে না।[১২৬] আর এটা করা স্বাস্থ্যসম্মত নয়, ফলপ্রসূও নয়। বারবার এক কাজ থেকে আরেক কাজে মনোযোগ দিতে দিতে দেখা যায় কোনো কাজই করা হয়নি। আর করা হলেও আশানুরূপ হয়নি।

একসাথে অনেক কাজ করার বিষয়টিকে ইংলিশে বলা হয় *Multitasking*। *Multitasking* হচ্ছে কম্পিউটার সায়েন্সের একটি পরিভাষা। আমাদের ব্রেইন যে রকম একসাথে অনেকগুলো কাজ ভালোমতো করতে পারে না, কম্পিউটারের ক্ষেত্রেও একই কথা খাটে। যদিও সবাই মনে করে, আমরা কম্পিউটারে একসাথে অনেকগুলো কাজ করতে পারছি। আসলে কম্পিউটারের প্রসেসর এত দ্রুত এক

---

[১২৬]https://www.theguardian.com/science/2015/jan/18/modern-world-bad-for-brain-daniel-j-levitin-organized-mind-information-overload

প্রোগ্রাম থেকে আরেক প্রোগ্রামে সুইচ করে যে, আমাদের ব্রেইন তা ধরতে পারে না। তাই আমাদের মনে হয় কম্পিউটার হয়তো সবগুলো কাজ একই সাথে একই সময়ে করছে।[১২৭] সমস্যা হচ্ছে, কম্পিউটারের প্রসেসর যেভাবে দ্রুত সুইচ করে এক প্রোগ্রাম থেকে আরেক প্রোগ্রামে, আমাদের ব্রেইন এত দ্রুত এক বিষয় থেকে আরেক বিষয়ে ফোকাস সরাতে পারে না। তাই জগাখিচুড়ি বাধে।

আমাদের হৃদয় খুব বেশি বিষয়কে একসাথে স্থান দিতে পারে না। একটি বিষয়কে বেশি গুরুত্ব দিলে আরেকটি সেখান থেকে উধাও হয়ে যায়। যে ছেলে গান শোনাতে আসক্ত, কুরআনের প্রতি ভালোবাসা কখনো তার হৃদয়ে স্থান পাবে না। মানবীর প্রেমে আসক্ত হয়ে পড়লে, রবের প্রতি ভালোবাসা সে হৃদয় থেকে চলে যায়। ক্রিকেট খেলায় প্রিয় দলের হার দেখে যে ছেলে কাঁদে, পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে মুসলিম উম্মাহর কষ্ট তাকে স্পর্শ করবে এ সম্ভাবনা ক্ষীণ। এ কারণে আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

مَا جَعَلَ اللَّـهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ

“আল্লাহ কোনো মানুষের অভ্যন্তরে দুটি হৃদয় সৃষ্টি করেননি।”[১২৮]

ঠিক এ কারণেই যখন দুনিয়ার চিন্তায় আমরা দিন-রাত মশগুল থাকি, আখিরাতের চিন্তা আমাদের মাথা থেকে উধাও হয়ে যায়। দুনিয়া এমন যে, তা খুব সহজে আমাদের মায়ার বাঁধনে বেঁধে ফেলে। কিন্তু আমাদের আসল ঠিকানা তো আখিরাতে। রাসূল ﷺ তাই দুনিয়ার কিছু পছন্দ হয়ে গেলে বলতেন,

لبيك إن العيش عيش الآخرة

“তোমার ডাকে সাড়া দিতে আমি হাজির (হে আল্লাহ)। আসল জীবন তো আখিরাতের জীবন।”[১২৯]

➡ তিনি যেন নিজেকে স্মরণ করিয়ে দিতেন :

---

[১২৭] The Myth of Multitasking: How Doing It All Gets Nothing Done- Dave Crenshaw, page: 30.

[১২৮] সূরা আহযাব, ৩৩ : ৪

[১২৯] ইবনে আবি শাইবা, হাদিস নং : ১৫৮০৬

❈ আমি আল্লাহর ডাকে সাড়া দিচ্ছি। নিজের প্রবৃত্তির ডাকে না, অন্য কারও ডাকে না।

❈ আমি আল্লাহর কাছে ক্ষণস্থায়ী দুনিয়ার জীবন না, বরং চিরস্থায়ী আখিরাত কামনা করছি।

❈ দুনিয়ার কারণে আমি আমার শেষ ঠিকানাকে ভুলে যাইনি।

ইমাম নববী ﵀ এ সম্পর্কে বলেন,

“যদি কেউ কোনো কিছু দেখে মুগ্ধ হয়ে যায় তবে সে যেন বলে,

لبيك إن العيش عيش الآخرة

“তোমার ডাকে সাড়া দিতে আমি হাজির (হে আল্লাহ)। আসল জীবন তো আখিরাতের জীবন।”[১৩০]

একজন মুসলিম হিসেবে আমাদের মেইন ফোকাস হচ্ছে আখিরাত। কিন্তু এই দুনিয়ার চাকচিক্য খুব সহজেই আমাদেরকে আমাদের ফোকাস থেকে বাইরে নিয়ে যায়। এরপর যখনই এ দুনিয়া আপনাকে মুগ্ধ করবে, এটি বলুন। দুনিয়ার মায়ায় নিজেকে না বেঁধে পরকালের জন্য জীবনটাকে গোছান।

[১৩০] শরহু মুসলিম : ৮/৯১

নিজের হীনতা প্রকাশ করা

➥ ইবাদত কী?

আমরা ইবাদত বলতে সাধারণত সালাত, সিয়াম, হজ্জ—এসবকেই বুঝে থাকি। সন্দেহ নেই, এগুলো হচ্ছে দীন ইসলামের স্তম্ভ। খুবই গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত। তবে ইবাদতের ধারণা শুধু এসবেই সীমাবদ্ধ না। ইবাদতকে মূলত দুইভাগে ভাগ করা হয় :

❈ বাহ্যিক ইবাদত। যেমন : সালাত, সিয়াম, হজ্জ, সদকাহ।

❈ আত্মিক ইবাদত। যেমন : আল্লাহ তা'আলাকে ভয় করা, তাঁর ওপর ভরসা করা, দুনিয়ার সবকিছুর চেয়ে তাঁকে বেশি ভালোবাসা।

এখন যেটা নিয়ে বলব সেটা দ্বিতীয় প্রকার ইবাদত। এ ইবাদতটি আত্মিক। এমনকি সকল ইবাদতের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে এটি অর্জন করতে পারা। এটি হচ্ছে, আল্লাহর কাছে নিজের হীনতা প্রকাশ করা। আসমান ও জমিনের রবের সামনে নিজের তুচ্ছতার ঘোষণা দেয়া। এটি হচ্ছে :

❈ যখন আমরা অনুভব করি, আমাদের অস্তিত্ব তাঁর দয়ার ওপর নির্ভরশীল।

❈ যখন আমরা আল্লাহর উদ্দেশে সিজদা করে মাথা ওঠাই। কিন্তু হৃদয়টা তখনো সিজদার জায়গাতেই পড়ে থাকে।

❈ যখন আমরা সবার সাথে হাসিমুখে কথা বলি, গল্প করি, কিন্তু

হৃদয়ের ভেতর থেকে আল্লাহর উদ্দেশে বলে উঠি, “আল্লাহ্ গো, আমাকে আমার ইচ্ছার ওপর ছেড়ে দিয়ো না। তোমার দয়া ও ক্ষমা ছাড়া আমি এক মুহূর্তও বাঁচতে পারব না। আমি মিসকিন। তোমার ক্ষমার কাঙাল। তুমি যদি আমায় ক্ষমা না করো, আমায় পথ না দেখাও, তবে আমি কোথায় যাব? আল্লাহ গো, পৃথিবীর কারও যদি আমার গুনাহ্ সম্পর্কে সামান্য ধারণাও থাকত, তারা আমার দিকে থুতুও নিক্ষেপ করত না। কিন্তু পাহাড়সম গুনাহ্ থাকার পরেও তুমি আমায় বাঁচিয়ে রেখেছ। আমাকে নিরাশ হতে নিষেধ করেছ।”

কখনো কি এমনটা অনুভব করেছেন? না পারলে রাসূল ﷺ-এর এই দু‘আটি নিয়ে চিন্তা করুন :

اللّٰهُمَّ لك ركعت، وبك آمنت، ولك أسلمت. خشع لك سمعي، وبصري، ومخي، وعظمي، وعصبي

“হে আল্লাহ, আমি তোমার প্রতি নত হই, তোমার ওপর ঈমান আনি আর তোমার কাছেই নিজেকে সমর্পণ করি। আমার শ্রবণ, আমার দর্শন, আমার মেধা, আমার হাড়, আমার শিরা-উপশিরা সবকিছুই তোমার দিকে সমর্পিত।”[১৩১]

লক্ষ করুন, মানুষের মধ্যে সবচেয়ে উত্তম হয়েও কীভাবে রাসূল ﷺ নিজের দুর্বলতা তাঁর রবের নিকট প্রকাশ করছেন। আর এমনটা করতে পারাই হচ্ছে সকল ইবাদতের মূল দাবি।[১৩২] এ ইবাদতই জান্নাতে প্রবেশের সবচেয়ে বড় দরজা। কিন্তু এটা বলা একটুও বাড়াবাড়ি হবে না যে, আমরা প্রায় সবাই আজ ইবাদতের এই স্বাদ থেকে নিজেকে বঞ্চিত করে রেখেছি। ইমাম ইবনুল কায়্যিম رحمه الله তাই লিখেছেন:

“আমি ইবাদতের সকল দরজা দিয়েই আল্লাহর নৈকট্য অর্জন করার চেষ্টা করেছি। কিন্তু যখনই আমি কোনো দরজার কাছে যাওয়ার চেষ্টা করেছি, আমি সেখানে মানুষের এত ভিড় দেখেছি যে প্রবেশ করতে পারিনি।”[১৩৩]

অর্থাৎ সালাত, সিয়াম, সদকাহ, দাওয়াহ—এই ইবাদতগুলো মানুষ এত বেশি

[১৩১] সহীহ মুসলিম, হাদিস নং : ৭৭১

[১৩২] আভিধানিকভাবে العبادة (ইবাদত) বলতে নিজেকে সমর্পণ করাকে বোঝানো হয়। নিজের হীনতা প্রকাশ করানোকে বোঝানো হয়। এ কারণে আরবরা طريق مُعَبَّدْ (তরিকুন মু’আব্বাদ) বলতে এমন রাস্তাকে বোঝায় যা বহু মানুষ হাঁটার কারণে সমতল হয়ে গেছে।

[১৩৩] মাদারিজুস সালেকীন : ১/৪২৯

পরিমাণে করে থাকে যে, এ ক্ষেত্রে সবার সাথে প্রতিযোগিতা করা বেশ কঠিন। তাই ইবনুল কায়্যিম ﷺ এ দরজাগুলো দিয়ে প্রবেশ করতে পারেননি। তাহলে কী উপায়? সেটা ইবনুল কায়্যিমই ﷺ বলে দিয়েছেন,

حَتَّى جِئْتُ بَابَ الذُّلِّ وَالِافْتِقَارِ، فَإِذَا هُوَ أَقْرَبُ بَابٍ إِلَيْهِ وَأَوْسَعُهُ، وَلَا مُزَاحِمَ فِيهِ وَلَا مُعَوِّقَ، فَمَا هُوَ إِلَّا أَنْ وَضَعْتُ قَدَمِي فِي عَتَبَتِهِ، فَإِذَا هُوَ سُبْحَانَهُ قَدْ أَخَذَ بِيَدِي وَأَدْخَلَنِي عَلَيْهِ

"(এভাবে চেষ্টা করতে করতে) আমি (আল্লাহর কাছে) 'হীনতা ও দরিদ্রতা' প্রকাশের দরজার সামনে এলাম। আমি দেখলাম এ দরজা দিয়েই সবচেয়ে দ্রুত আল্লাহর নৈকট্য অর্জন করা যাবে। আর দরজাটিও বেশ প্রশস্ত। কিন্তু অবাক হয়ে দেখলাম, এ দরজার সামনে কোনো ভিড়ই নেই, কোনো বাধাও নেই। ভেতরে পা রাখার সাথে সাথেই তিনি নিজ হাতে আমাকে ভেতরে নিয়ে এলেন আর আমি ভেতরে হাঁটার সুযোগ পেলাম।"[১৩৪]

ইবনুল কায়্যিম ﷺ-এর মতে আসমান ও জমিনের মালিকের কাছে নিজের হীনতা প্রকাশ করতে পারা, মনের দারিদ্র্য প্রকাশ করতে পারার ব্যর্থতাই বহু মানুষকে আল্লাহ তা'আলার নৈকট্য অর্জন করতে দিচ্ছে না। আর এখানেই আমরা অনেকেই পিছিয়ে পড়ছি। পার্থক্যটা ঠিক এখানেই।

আমাদের লেবাস নয়, সুন্দর করে কথা বলার গুণও নয়, কিংবা তুখোড় কোনো ইসলামিক পোস্টও আমাদের আলাদা করে না। অনেক বড় সেলিব্রেটি হতে পারাও আমাদের আল্লাহর কাছে নিয়ে যায় না। সত্যি বলতে, আল্লাহর সাথে নির্জনে আমাদের সম্পর্কই আমাদের অন্য সবার থেকে আলাদা করে, মর্যাদাবান করে। এ সম্পর্কের কথা কেউ জানে না, কেউ দেখে না। তবে যার দেখা যথেষ্ট, তিনি ঠিকই দেখেন।

আমরা কনকনে শীতের রাতে জেগে জেগে আল্লাহ তা'আলার ইবাদত করি। গ্রীষ্মের প্রখর রোদে সিয়াম পালন করি। সদকা করি। ইলম অর্জনের চেষ্টা করি। দূর-দূরান্তে চলে যাই। সবকিছুর পেছনে একটাই উদ্দেশ্য—আল্লাহ তা'আলার ক্ষমা অর্জন করা, তাঁর নৈকট্য পাওয়া।

অথচ কত কাছেই রয়েছে আল্লাহর ক্ষমা। কত কাছেই না রয়েছে মুক্তি।

[১৩৪] মাদারিজুস সালেকীন : ১/৪২৯

আলো জ্বালিয়েছেন তো?

পুরুষদের জন্য মসজিদে সালাত পড়ার বাধ্যবাধকতা, মসজিদে সালাত পড়ার সওয়াবের কথা আমরা সবাই-ই কম-বেশি জানি। কিন্তু আমরা কি জানি কখনো কখনো মসজিদের চেয়ে বাসাতেই সালাত পড়া উত্তম?

➡ রাসূল ﷺ-এর এই হাদিসটি লক্ষ করুন :

فَصَلُّوا أَيُّهَا النَّاسُ فِي بُيُوتِكُمْ، فَإِنَّ أَفْضَلَ الصَّلاَةِ صَلاَةُ المَرْءِ فِي بَيْتِهِ إِلَّا المَكْتُوبَةَ

“হে লোকসকল, তোমরা ঘরে সালাত আদায় করো। কারণ, ফরয সালাত ছাড়া সকল সালাত ঘরে পড়াই উত্তম।”[১৩৫]

রাসূল ﷺ এই হাদিসটি মদিনার লোকদের উদ্দেশ্যে বলেছিলেন। যাদের সামনে ছিল মাসজিদুন নববীতে সালাত পড়ার সুযোগ। তারপরেও তিনি তাদের ঘরে সালাত পড়তে উদ্বুদ্ধ করেছেন। রাসূল ﷺ আমাদের আরও জানিয়েছেন,

تطوُّعُ الرجل في بيتِهِ يزيدُ على تطوُّعِه عندَ الناس، كفضْلِ صلاة الرجل في جماعةٍ على صلاتهِ وحدَه

“সবার সামনে সালাত পড়ার চেয়ে কারও জন্যে ঘরে সালাত পড়া ততটাই ভালো, যতটা ভালো কারও একা একা সালাত পড়ার চেয়ে জামাতে সালাত

[১৩৫] সহীহ বুখারি, হাদিস নং : ৭৩১

আদায় করা।”[১৩৬]

এ কারণে কোনো কোনো আলেম উল্লেখ করেছেন, বাসায় বসে নফল সালাত আদায় করা সবচেয়ে পবিত্র তিনটি মসজিদে[১৩৭] নফল সালাত আদায় করার চেয়েও উত্তম।[১৩৮]

আবার কেউ কেউ বলেছেন, কাবার মধ্যে নফল সালাত আদায় করার চেয়েও ঘরে নফল সালাত আদায় করা উত্তম।[১৩৯]

অথচ আমরা সবাই এ বিশাল সওয়াব থেকে না জানার কারণে নিজেকে বঞ্চিত করি। মসজিদে এটি আরও ভালোভাবে লক্ষ করা যায়। দেখা যায়, ফরয সালাত শেষে বাকি সালাতটুকু পড়তে সবাই সাথে সাথেই দাঁড়িয়ে যাচ্ছে। অথচ রাসূল ﷺ-এর সুন্নাহ ছিল বাসায় গিয়ে সালাত আদায় করা।[১৪০]

ইমাম নববী ﵀ এ ব্যাপারে বলেছেন,

“(নফল সালাত ঘরে পড়াই) ভালো। কারণ, এতে লোক দেখানোর কোনো ব্যাপার থাকে না আর এর ফলে নিজের ভালো আমলগুলো নষ্ট হবার আশঙ্কাও থাকে না। এই সালাতগুলো দ্বারা ঘর বরকতপূর্ণ হয়। (আল্লাহ তা‘আলার) রহমত ও ফেরেশতারা (সে ঘরে) অবতীর্ণ হয়। আর শয়তান সেখান থেকে পালিয়ে যায়।”[১৪১]

আমাদের সকল সালাত মসজিদকেন্দ্রিক হয়ে যাওয়ায় সালাতের কল্যাণ থেকে আমাদের ঘর বঞ্চিত হয়। এমনটা করতে রাসূল ﷺ নিষেধ করে বলেছেন,

اجْعَلُوا فِي بُيُوتِكُمْ مِنْ صَلاَتِكُمْ وَلاَ تَتَّخِذُوهَا قُبُورًا

---

[১৩৬] ইবনে আবি শাইবা, হাদিস নং : ৬৪৫৫

[১৩৭] ১. মাসজিদুল হারাম, মক্কা; ২. মাসজিদুন নববী, মদিনা; ৩. মাসজিদুল আকসা, জেরুজালেম।

[১৩৮] মাতালিবু উলিন নুহা : ২/৩৮৩

[১৩৯] দালিলুল ফালিহিন : ৬/৬০১

[১৪০] আয়েশা (রা) বলেন, “রাসূল ﷺ যোহরের সালাতের আগে আমার ঘরে চার রাকাত সালাত আদায় করতেন। এরপর বেরিয়ে গিয়ে লোকদের নিয়ে জামাতে সালাত আদায় করতেন। তারপর ঘরে এসে দু-রাকাত সালাত আদায় করতেন। আর তিনি লোকদের নিয়ে মাগরিবের সালাত আদায় করতেন। এরপর ঘরে এসে দু-রাকাত সালাত আদায় করতেন। আর ইশার সালাত লোকদের নিয়ে আদায় করতেন। তারপর আমার ঘরে এসে দু-রাকাত পড়তেন এবং তিনি রাতের বেলা নয় রাকাত সালাত আদায় করতেন, যার মাঝে বিতরও রয়েছে।” (সহীহ মুসলিম, হাদিস নং : ৭৩০)

[১৪১] শরহু মুসলিম : ৬/৬৮

"কিছু সালাত ঘরে পড়ো। তোমাদের ঘরকে কবর বানিয়ে ফেলো না।"[১৪২]

আমরা সুন্দর সুন্দর পেইন্টিং লাগিয়ে, সিলিং এ ঝাড়বাতি ঝুলিয়ে, নানান রঙের বাল্ব জ্বালিয়ে আমাদের ঘরকে আলোকিত করতে চাই। অথচ যে কাজটা সত্যিই আমাদের ঘরকে আলোকিত করে সেটার কথা ভুলে যাই।

যে আলোর কথা বলেছেন উমার ﵁ :

صَلَاةُ الرَّجُلِ فِي بَيْتِهِ نُورٌ، فَنَوِّرُوا بُيُوتَكُمْ

"ঘরে সালাত আদায় করা হচ্ছে নূর। এর দ্বারা তোমাদের ঘরকে আলোকিত করো।"[১৪৩]

[১৪২] সহীহ বুখারি, হাদিস নং : ৪৩২
[১৪৩] ইবনে আবি শাইবা, হাদিস নং : ৬৪৬০

এটাকেও লিস্টে স্থান দিন

- "এই ফোন নিয়েছ তো?"
- "চাবি নিতে ভুলে যেয়ো না কিন্তু।"
- "খবরদার! সোয়েটার না পরে বের হবে না। বাইরে প্রচণ্ড শীত।"

এ কথাগুলো প্রায়ই আমরা আমাদের প্রিয়জনদের বলি যখন তারা বাসার বাইরে বের হয়। আমরা তাদের ভালো চাই। এ জন্য তাদের যাতে অসুবিধা না হয় সেদিকে খুব ভালোমতো খেয়াল করি। আর এমনটা করা অবশ্যই উচিত। তবে ওপরের লিস্টগুলোর সাথে এটা জুড়ে দিলে কেমন হয়?

রাসূল ﷺ বলেন,

إذا خرجت من منزلك فصل ركعتين تمنعانك مخرج السوء، وإذا دخلت منزلك فصل ركعتين تمنعانك مدخل السوء

"বাসা থেকে বের হবার সময় দুই রাকাত সালাত পড়বে। এটা তোমাকে বের হবার অনিষ্ট থেকে রক্ষা করবে। আবার যখন বাড়িতে ফিরে আসবে তখন দুই রাকাত সালাত পড়বে। এটা তোমাকে প্রবেশের অনিষ্ট থেকে রক্ষা করবে।"[১৪৪]

'অনিষ্ট' বলতে আসলে এখানে কী বোঝানো হচ্ছে তার ব্যাখ্যায় ইমাম মানাওই রহিমাহুল্লাহ বলেন,

[১৪৪] মুসনাদে বাযযার, হাদিস নং : ৮৫৬৭

أي ما عساه خارج البيت من السوء

"কেউ বাসার বাইরে খারাপ যা কিছুর সম্মুখীন হতে পারে, এটা (অনিষ্ট) দিয়ে তা-ই বোঝানো হচ্ছে।"[১৪৫]

নিজেকে আর নিজের কাছের মানুষদের সম্ভাব্য সব রকম বিপদ থেকে রক্ষার জন্য রাসূল ﷺ আমাদের সুন্দর একটি উপায় বলে দিয়েছেন। এ দুই রাকাত সালাত আদায় করা কি খুব কষ্টের কিছু?

তারপরেও যাদের জন্য এই কাজ করা কষ্টের, তাদের জন্য আরও সহজ কিছু আছে। রাসূল ﷺ বলেন, "যদি কেউ বাসা থেকে বের হবার সময় বলে :

بِسْمِ اللَّـهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّـهِ لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللَّـهِ

'আল্লাহর নামে শুরু করছি। তাঁর ওপর ভরসা করছি। আল্লাহ সাহায্য ছাড়া কারও অকল্যাণ থেকে বাঁচার কোনো উপায় নেই আর ভালো কাজ করারও কোনো সামার্থ্য নেই।'

তখন ফেরেশতা তাকে বলে, 'তুমি হিদায়াত পেয়েছ, তোমাকে সব ধরনের বিপদ থেকে রক্ষা করা হয়েছে এবং এ দু'আই তোমার জন্য যথেষ্ট হয়েছে।' তখন শয়তান তার থেকে আলাদা হয়ে যায়, আর অন্য শয়তান তাকে বলে,

'এখন তুমি তার কী ক্ষতি করতে পারবে? সে হিদায়াত পেয়েছে, এ দু'আ তার জন্য যথেষ্ট হয়েছে এবং তাকে সমস্ত বিপদ থেকে রক্ষা করা হয়েছে।'[১৪৬]

[১৪৫] ফয়দুল ক্বদীর : ১/৩১৪
[১৪৬] আবু দাউদ, হাদিস নং : ৫০৯৫

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে জুতো না পরা

অনেক সময় দেখা যায়, দেয়ালে ভর দিয়ে আমরা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে জুতো পরার চেষ্টা করছি। সবচেয়ে বেশি সমস্যা হয়, যখন আমরা এভাবে শু পরার চেষ্টা করি। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে জুতোর ভেতরে পা ঢোকাতে বেশ কসরত করতে হয়। এভাবে জুতা পরতে শুধু সময় যে বেশি লাগে তা না, কষ্টও বেশি করতে হয়। একই কাজ যদি রাসূল ﷺ-এর নির্দেশনা মেনে করা হয়, তাহলে কষ্ট কিন্তু অনেকটাই কমে যাবে।

জাবির رضي الله عنه বলেছেন,

نَهَى رَسُولُ اللَّـهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَنْتَعِلَ الرَّجُلُ قَائِمًا

"কাউকে দাঁড়িয়ে জুতো পরতে রাসূল ﷺ নিষেধ করেছেন।"[১৪৭]

ইমাম মানাওই رحمه الله এই হাদিসের ব্যাপারে মন্তব্য করেছেন,

"(রাসূল ﷺ-এর) এই নির্দেশনাটি আসলে উপদেশ। কারণ, (দাঁড়িয়ে পরার চেয়ে) বসে বসে জুতো পরা বেশ সহজ। আত-তিবি رحمه الله এবং অন্যান্যরা এই হাদিস থেকে এই সিদ্ধান্ত দিয়েছেন যে, (দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে জুতো পরার) নিষেধাজ্ঞা শুধু সেসব জুতো পরার ব্যাপারে খাটে, যেগুলো দাঁড়িয়ে পরা কঠিন। যেমন : খুফফ[১৪৮] ।"[১৪৯]

---

[১৪৭] আবু দাউদ, হাদিস নং : ৪১৩৫

[১৪৮] خُفّ (খুফফ)। চামড়ার মোজা।

[১৪৯] ফয়দুল ক্বদীর : ৬/৩৪১

তাই, যেসব জুতো দাঁড়িয়ে পরা কষ্টকর না, তা এই নিষেধাজ্ঞার বাইরে। যেমন : আমরা যে স্যান্ডেলগুলো পরি তা দাঁড়িয়ে পরতে কোনো কষ্টই হয় না। অন্যদিকে, শু যদি দাঁড়িয়ে পরা হয়, তখন যে কসরত করে এটি পরতে হয়, তা বাইরে থেকে দেখলে বেশ দৃষ্টিকটু লাগে।

একবার ভেবে দেখুন, ইসলাম কত যত্নের সাথে আমাদের বাহ্যিক-অভ্যন্তরীণ সকল বিষয়ে খেয়াল রেখেছে। তাই আমরা বাহ্যিকভাবে সুন্নাহর অনুসরণ করব কিন্তু আমাদের কথায়, আচরণে সুন্নাহর প্রকাশ পাবে না, এমনটা হওয়া কি উচিত?

এই সুন্নাহ দিয়ে শুরু করুন। এভাবে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্র সুন্নাহ দিয়ে সাজিয়ে ফেলুন।

মুসলিম ভাইয়ের সাথে হাত মেলানোর সময়

মুসলিমদের মধ্যে পারস্পরিক ভালোবাসা বৃদ্ধির জন্য বেশ কিছু শিষ্টাচার রাসূল ﷺ আমাদের শিখিয়েছেন। এর মধ্যে একটি হচ্ছে, দেখা হলে সালাম বিনিময় করে হাত মেলানো। এটি মুসলিমদের মধ্যে সৌহার্দ্য বাড়িয়ে দেয়। ভেতরে কোনো রাগ, ঘৃণা থাকলে তা দূর করে দেয়। রাসূল ﷺ বলেন,

مَا مِنْ مُسْلِمَيْنِ يَلْتَقِيَانِ، فَيَتَصَافَحَانِ إِلَّا غُفِرَ لَهُمَا قَبْلَ أَنْ يَفْتَرِقَا

"যখন দুইজন মুসলিম একে অপরের সাথে সাক্ষাৎ করে আর হাত মেলায়, তারা আলাদা হবার আগেই তাদের গুনাহসমূহ মাফ করে দেয়া হয়।"[১৫০]

সম্মানিত সাহাবিরাও এই সুন্নাহ অনুসরণ করতেন। কাতাদা রহিমাহুল্লাহ বলেন, "আমি আনাস ইবনে মালিক রাদিয়াল্লাহু আনহু-কে জিজ্ঞেস করলাম, 'রাসূল ﷺ-এর সাহাবিদের মধ্যে কি মুসাফাহা[১৫১] চালু ছিল?' তিনি বললেন, 'হ্যাঁ'।"[১৫২]

ইমাম নববী রহিমাহুল্লাহ বলেন, "এ ব্যাপারে আলেমগণ একমত যে, সাক্ষাতের সময়

[১৫০] আবু দাউদ, হাদিস নং : ৫২১২

[১৫১] المصافحة (মুসাফাহা)। একজনের হাতের সাথে আরেকজনের হাতের পার্শ্বদেশ মেলানোকে আরবিতে মুসাফাহা বলা হয়।

[১৫২] সহীহ বুখারি, হাদিস নং : ৬২৬৩

হাত মেলানো সুন্নাহ।”[১৫৩]

তবে শুধু লোক দেখানো হাত মেলানো নয়, কীভাবে আন্তরিকতা নিয়ে হাত মেলাতে হবে তার দৃষ্টান্তও তিনি রেখে গেছেন। আনাস ইবনে মালিক ﵁ বলেন,

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَافَحَ رَجُلًا لَمْ يَنْزِعْ يَدَهُ مِنْ يَدِهِ حَتَّى يَكُونَ الرَّجُلُ هُوَ الَّذِي يَنْزِعُ

“রাসূল ﷺ যখন কারও সাথে সাক্ষাৎ করতেন, অপর ব্যক্তিই প্রথমে হাত সরিয়ে না নেয়া পর্যন্ত তিনি নিজ থেকে হাত সরাতেন না।”[১৫৪]

জ্ঞানে-মর্যাদায় সবার থেকে ওপরে থেকেও তিনি কতই-না দরদ দেখাতেন! মানুষের অনুভূতির দিকে নজর রাখতেন। তাদের গুরুত্ব দিতেন। ভালোবাসতেন।

সামান্য হাত মেলানোর সময়েই তিনি কত মমতা প্রকাশ করতেন! যারা সামান্য কারণেই মুসলিমদের বয়কট করে, তার ভাইয়ের সাথে সাক্ষাৎ করা বন্ধ করে দেয়, তাদের ব্যাপারে উনি কী বলতেন ভাবা যায়?

এরপর থেকে কোনো মুসলিম ভাইয়ের সাথে দেখা হলে এই সুন্নাহ অনুসরণের চেষ্টা করুন। আমাদের সময়ে এটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি সুন্নাহ।

দামি সুন্নাহ!

---

[১৫৩] ফাতহুল বারি : ১১/৫৫

[১৫৪] শু‘আবুল ঈমান, হাদিস নং : ৭৭৮০

ভরপেট খাওয়া?

'পেটপূজা' নামে একটি শব্দ আমাদের মধ্যে খুব জনপ্রিয়। শব্দটি শুনে মনে হয় আমরা খাওয়ার জন্য বাঁচি। বাঁচার জন্য খাই না। যখন খেতে বসব, পেট না ভরা পর্যন্ত গপ গপ করে খাওয়া আমাদের অভ্যাস হয়ে গেছে। আমাদের জন্য রাসূল ﷺ-এর একটি সতর্কবাণী রয়েছে। তিনি বলেছেন,

إِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ شِبَعًا فِي الدُّنْيَا أَكْثَرُهُمْ جُوعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ

"আজ যাদের পেট পূর্ণ থাকবে, কিয়ামতের দিন তারাই সবচেয়ে বেশি ক্ষুধার্ত থাকবে।"[১৫৫]

এ হাদিসটি শোনার পর সাহাবি আবু জুহাইফা رضي الله عنه আর কখনোই পেটভরে খাননি।[১৫৬]

আজ আমরা প্রায়ই নিজেদের ঈমানের দুর্বলতা নিয়ে আশঙ্কা প্রকাশ করি। অন্তরের কাঠিন্য নিয়ে আক্ষেপ করি। সীরাত পড়তে বসলে সাহাবিদের ঈমানদ্বীপ্ত জীবনী দেখে অবাক হয়ে যাই। তারা যেভাবে আল্লাহর রাস্তায় নিজেকে বিলিয়ে দিতে পারতেন, কুরআন শুনে অঝোরে কাঁদতেন, রাতের পর রাত সালাতে দাঁড়িয়ে থাকতেন—কেন আমরা তা পারি না? কারণ, তারা দুনিয়ার জন্য বাঁচতেন না, খাওয়া-দাওয়া আর টাকাপয়সা কামানোই তাদের জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য

[১৫৫] তিরমিযী, হাদিস নং : ২৪৭৮
[১৫৬] উমদাতুল কারি : ২১/৫৩

ছিল না।

ইমাম আহমাদ ﵀-কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল :

يَجِدُ الرَّجُلُ مِنْ قَلْبِهِ رِقَّةً وَهُوَ يَشْبَعُ

“যার পেট পূর্ণ সে কি অন্তরে কোমলতা অনুভব করতে পারে?”

তিনি বললেন,

ما أرى

“আমি মনে করি না।”[১৫৭]

লোকমান হাকিম ﵀ তাঁর ছেলেকে উপদেশ দিয়ে বলেছিলেন,

يا بني، إذا امتلأت المعدة نامت الفكرة، وخرست الحكمة، وقعدت الأعضاء عن العبادة

“ছেলে! যার পেট পূর্ণ থাকে, তার চিন্তা করার ক্ষমতা ঘুমিয়ে যায়। তার প্রজ্ঞা চুপ হয়ে যায়। আর তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে আল্লাহর ইবাদত করার স্পৃহা মরে যায়।”[১৫৮]

উমার ﵁ লোকদের উদ্দেশ্যে একদিন বলেছিলেন, “আল্লাহর কসম! আমি চাইলে তোমাদের সবার চেয়ে ভালো পোশাক পরতে পরতাম। সবচেয়ে ভালো খাবার খেতে পারতাম। আর সবচেয়ে বিলাসবহুলভাবে জীবনযাপন করতে পারতাম। কিন্তু আমি শুনেছি আল্লাহ তা‘আলা কিছু লোককে এই বলে তিরস্কার করবেন :

أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ تَفْسُقُونَ

‘তোমরা তোমাদের পার্থিব জীবনেই তোমাদের অংশের নিয়ামতগুলো নিঃশেষ করে করে ভোগ করেছ। তাই আজ তোমাদের অপমানজনক শাস্তি

[১৫৭] জামি‘উল উলুম : ২/৪৬৯
[১৫৮] তফসীরুল মওদু‘ঈ : ১/২২২

দ্বারা প্রতিফল দেয়া হবে। কারণ, তোমরা দুনিয়াতে অহংকার করেছিলে। তোমরা ছিলে নাফরমান'[১৫৯] ।"[১৬০]

ইচ্ছা থাকলে ভরপেটে না খাওয়ার এই সুন্নাহটি আমরা সবচেয়ে ভালোভাবে রপ্ত করতে পারি রমাদানের সময়। তারপর বাকি বছর এই সুন্নাহ পালনের চেষ্টা করে যেতে পারি। আমাদের ভালোভাবে বেঁচে থাকার জন্য কিন্তু খুব বেশি খাবারের প্রয়োজন নেই। প্রয়োজনটুকু পূরণ করে সবার উচিত আখিরাতের দিকে ফোকাস করা। আমাদের চিরস্থায়ী ঠিকানা তো সেখানেই।

রাসূল ﷺ বলেছেন,

ما ملأ آدميٌّ وعاءً شرًّا من بطنٍ ، بحسبِ ابنِ آدمَ أُكْلاتٍ يُقِمْنَ صُلبَه ، فإن كان لا محالةَ ، فثُلُثٌ لطعامِه ، و ثُلُثٌ لشرابِه ، و ثُلُثٌ لنفَسِه

"মানুষ এমন কোনো পাত্রই পূর্ণ করেনি, যা পেটের চাইতে মন্দ । সামান্য খাবারই যথেষ্ট আদমসন্তানের জন্য যা তার পিঠকে সোজা রাখবে। কিন্তু তারপরেও যদি তোমরা বেশি খেতেই চাও; তবে পেটের এক-তৃতীয়াংশ খাবারের জন্য, এক-তৃতীয়াংশ পানির জন্য আর এক-তৃতীয়াংশ নিশ্বাসের জন্য রাখবে।"[১৬১]

---

[১৫৯] সূরা আহকাফ, ৪৬ : ২০
[১৬০] হিলিয়াতুল আওলিয়া : ১/৪৯
[১৬১] তিরমিযী, হাদিস নং : ২৩৮০

ভোরের আলোয়

ভোরের সোনালি আলো পড়ে চারদিকটা স্বর্ণের মতো চকচক করছে। কাছে কোথাও মধুর সুরে কোকিল ডাকছে। বাতাসে ভেসে বেড়াচ্ছে সজীবতার ঘ্রাণ। পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষ তখন বিভোরে ঘুমোচ্ছে। তবে রহমানের বান্দারা দিনটাকে শুরু করছে তাদের রবকে স্মরণ করে। রাসূল ﷺ-এর সুন্নাহকে অনুসরণ করে। আর সে সুন্নাহ হচ্ছে ফজরের পর সূর্য ওঠা পর্যন্ত মসজিদে বসে থেকে আল্লাহর কথা স্মরণ করা। তাঁর যিকিরে অন্তরটাকে প্রশান্ত করা।

সন্দেহ নেই, আমাদের সময়ে এই সুন্নাহটি সবার মধ্যে থেকে ধীরে ধীরে হারিয়ে যাচ্ছে। সাধারণ মানুষ দূরে থাক, অনেক তলিবুল ইলমও এখন এই সুন্নাহটি পালন করতে গড়িমসি করে। দুনিয়ার সামান্য কিছু ব্যস্ততা তাদের এই সুন্নাহ থেকে দূরে সরিয়ে নেয়।

আর আমাদের মতো সাধারণ মানুষেরা? আমাদের দৈনন্দিন রুটিন আর রাসূল ﷺ-এর রুটিন মেলালে মনে হবে আমরা তাঁর সাথে প্রতিযোগিতা করছি। তবে সেটা অনুসরণের প্রতিযোগিতা না, তাঁর রুটিনের সাথে আমাদের রুটিনটাকে কত বিপরীতভাবে সাজানো যায় সেটার প্রতিযোগিতা। রাসূল ﷺ ইশার সালাতের পর খুব কম সময়ই জেগে থাকতেন। রাতে যখন এক-তৃতীয়াংশ বাকি থাকত, তখন ঘুম থেকে উঠে সালাতে দাঁড়িয়ে যেতেন। মাঝরাতের সুনসান নীরবতায় তাঁর মালিককে

স্মরণ করতেন।[১৬২]

অন্যদিকে আমরা? আমাদের তো রাত শুরুই হয় ইশার পরে। দ্বীনি কাজ করার ছুতো দিয়ে আমরা গভীর রাত পর্যন্ত জেগে থাকি। তারপর বেশির ভাগ সময়েই ফজর মিস করে ফেলি। আর যদি ফজর পড়িও, তবে সেটা অর্ধেক ঘুমে থাকা অবস্থায়। কোনোমতো সালাম ফিরিয়েই আবার বিছানায় গা এলিয়ে দিই।

রাসূল ﷺ ফজরের পর কী করতেন? শোনা যাক সাহাবি জাবির ইবনে সামুরার رضي الله عنه মুখ থেকে :

كَانَ لَا يَقُومُ مِنْ مُصَلَّاهُ الَّذِي يُصَلِّي فِيهِ الصُّبْحَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، فَإِذَا طَلَعَتْ قَامَ

"রাসূল ﷺ ভোরের সালাত আদায় করার পর সূর্য না ওঠা পর্যন্ত নিজের জায়গা ছেড়ে উঠে যেতেন না। সূর্য ওঠার পর তিনি উঠতেন।"[১৬৩]

আল্লাহ তা'আলা সকালকে করেছেন বরকতময়।[১৬৪] তাই আল্লাহর দ্বীনের অনুসারী হয়ে পুরো সকাল ঘুমিয়ে কাটানো সাহাবিদের নিকট ছিল খুবই অপছন্দনীয়। ভোরের সময়ে ঘুমানোর কথা বলতে গিয়ে সাহাবি আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ رضي الله عنه বলেন,

مَا نِمْتُ نَوْمَةَ الضُّحَى مُنْذُ أَسْلَمْتُ

"ইসলাম গ্রহণের পর থেকে কখনোই আমি এ সময়ে ঘুমাইনি।"[১৬৫]

---

[১৬২] ইবনে আব্বাস رضي الله عنه থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, "আমি আমার খালা মায়মুনা رضي الله عنها এর কাছে রাতের বেলায় ছিলাম। (ইশার পর) রাসূল ﷺ কিছুক্ষণ তাঁর পরিবারের সাথে গল্প করে শুয়ে পড়লেন। তারপর রাতের শেষ তৃতীয়াংশে তিনি উঠলেন এবং আসমানের দিকে তাকিয়ে বললেন,

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَاخْتِلاَفِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لآيَاتٍ لأُولِي الأَلْبَابِ

'নিশ্চয়ই আসমানসমূহ ও জমিনের সৃষ্টিতে এবং রাত ও দিনের আবর্তনের মধ্যে রয়েছে বিবেকসম্পন্নদের জন্য বহু নির্দশন।' (সূরা আলে ইমরান, ৩ : ১১৯)

এরপর দাঁড়ালেন এবং ওযু করে মিসওয়াক করে এগারো রাকাআত সালাত আদায় করলেন। তারপর বিলাল رضي الله عنه আযান দিলে তিনি দু-রাকাআত সালাত আদায় করলেন। এরপর বের হয়ে ফজরের সালাত আদায় করলেন।" (সহীহ বুখারি, হাদিস নং : ৪৫৬৯)

[১৬৩] আরশি'ফু মুলতাকা আহলিল হাদিস : ৫, ৫১/৩৩১

[১৬৪] সাখর আল গামেদি رضي الله عنه থেকে বর্ণিত, "রাসূল ﷺ বলেছেন, 'হে আল্লাহ, আমার উম্মাত দিনের শুরুতে যে কাজ করবে, তাতে বরকত দাও।' কোনো বাহিনী প্রেরণ করলে কিংবা সেনাবাহিনী পাঠালে তিনি তা দিনের শুরুতেই করতেন।" (সহীহ ইবনে হিব্বান, হাদিস নং : ৪৭৫৪)

[১৬৫] আনসাবিল আশরাফ লিল বালাযুরী : ১১/২১৯

আমাদের সালাফদের নিকট এ সময়ের গুরুত্বের কথা ভালোভাবে বোঝা যায়

➥ ইমাম আওযা’ঈ ﵀-এর বক্তব্য থেকে :

> “ফজরের সময় আমাদের সালাফরা এত শান্তভাবে বসে থাকতেন যেন তাদের মাথার ওপর পাখি বসে আছে। তারা এতটাই মন দিয়ে আল্লাহ তা‘আলাকে স্মরণ করতেন যে, দূর থেকে তাদের কোনো প্রিয় মানুষ এলেও তারা তার দিকে ফিরে তাকাতেন না। সূর্য না ওঠা পর্যন্ত তারা এ অবস্থাতেই থাকতেন।”[১৬৬]

এ সুন্নাহটি এখন বিলুপ্তপ্রায়। আপনার যদি একবার দেখার ইচ্ছা হয় মানুষ কীভাবে আজ এই সুন্নাহটিকে ভুলে গিয়েছে, তাহলে একদিন ফজরের পর দশ মিনিট অপেক্ষা করেই দেখুন না। দেখবেন, মসজিদ একদম ফাঁকা হয়ে গেছে। এমনও হতে পারে, কিছুক্ষণ পর মুয়াজ্জিন নিজেই এসে আপনাকে বাসায় গিয়ে যিকির করতে বলবেন।

হয়তো এ কারণেই আমাদের সময়ে খুব কম মানুষই এ সুন্নাহ অনুসরণ করেন। প্রতিদিন এই সুন্নাহ পালন করতে পারা খুবই কঠিন। এ জন্য প্রয়োজন দৃঢ় প্রতিজ্ঞা। আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর প্রতি গভীর ভালোবাসা। তাঁকে ভালোবেসে নিজের বিশ্রাম আর ঘুমের সময়টুকু ত্যাগ করার মানসিকতা থাকা। তবে একবার এ অভ্যাস রপ্ত করতে পারলে তখন বোঝা যাবে কেন আমাদের সালাফরা একে এত গুরুত্ব দিতেন। এ সুন্নাহ যেন আমাদের অন্তরকে একেবারেই বদলে দেবে। তাকওয়া বহুগুণে বাড়িয়ে দেবে। তাই যারা একবার অন্তরে এর প্রভাবকে অনুভব করেছেন, পরবর্তী সময় এই সুন্নাহ তাদের জীবনের একটি অপরিহার্য বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

এ কারণেই ইমাম ইবনে তাইমিয়া ﵀ সকাল থেকে প্রায় দুপুর পর্যন্ত একটানা বসে বসে আল্লাহ তা‘আলার যিকির করতেন। তার ছাত্র ইবনুল কায়্যিম ﵀-কে তিনি বলতেন,

هذه غدوتي لو لم أتغدى غدوتي سقطت قوتي

[১৬৬] তারিখে দিমাশক লি ইবনে আসাকির : ৩৫/১৮৪-৮৫

"এ হচ্ছে আমার সকালের নাশতা। এটা না করলে আমি দুর্বল হয়ে যাই।"[১৬৭]

ইবনে তাইমিয়া ﵀ কিন্তু মোটেও বাড়িয়ে বলেননি; বরং নিজের মনের কথাই বলেছেন। নিজে যা অনুভব করেছেন তা-ই তার ছাত্রকে বলেছেন। এই সুন্নাহ ইবনে তাইমিয়া ﵀-এর আত্মিক উন্নতিতে খুব সহায়তা করেছিল। অন্তরটাকে নূর দিয়ে পরিপূর্ণ করে দিয়েছিল। সে নূরের ঝলক শুধু ইবনে তাইমিয়া ﵀-কেই নয়, তার অসংখ্য ছাত্র ও অনুসারীদেরও আলোর দিশা দিয়েছে।

দাওয়াহ, পড়াশোনা, পরিবার—কোনোকিছুই এ ক্ষেত্রে তাদের জন্য বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারেনি। ভোরের আলোয় আপনি আবার ফিরে পাবেন আগের সেই অনুভূতিগুলোকে। ঠিক সেই সময়ের অনুভূতিগুলো, যখন আপনি প্রথম হৃদয় দিয়ে ইসলামকে অনুভব করেছিলেন। আবার আপনার অন্তরটা আল্লাহর স্মরণে বিগলিত হবে। ঈমানের মিষ্টি স্বাদে হৃদয়টা পরিপূর্ণ হবে। মনটা ভরে যাবে অনাবিল প্রশান্তিতে।

আত্মিক এই উপকারটুকুই যথেষ্ট যে কাউকে এই সুন্নাহ পালনে উৎসাহী করতে। তবে এখানেই শেষ নয়। আনাস ﵁ থেকে বর্ণিত, "রাসূল ﷺ বলেছেন, (১) যে জাম'আতের সাথে ফজরের সালাত আদায় করে, (২) তারপর সূর্যোদয় পর্যন্ত সেখানে বসে থেকে আল্লাহর যিকির করবে এবং (৩) এরপর দুই রাকাআত সালাত আদায় করবে, তার জন্য একটি হজ্জ ও উমরা পালনের সওয়াব হবে। আনাস ﵁ এরপর বলেন, রাসূল ﷺ বলেছেন, 'ওই ব্যক্তির জন্য হজ্জ ও উমরার পরিপূর্ণ সওয়াব হবে, পরিপূর্ণ সওয়াব হবে, পরিপূর্ণ সওয়াব হবে।"[১৬৮]

দুনিয়ার সামান্য ব্যাপারে আমরা কতই-না সচেতন! অথচ আল্লাহর রাসূল ﷺ আমাদের পরিপূর্ণ হজ্জ ও উমরার সওয়াবের কথা বলে গিয়েছেন যদি আমরা এই সুন্নাহ পালন করতে পারি।

➥ তাই আল্লাহর নাম নিয়ে কাল থেকেই শুরু করা যাক :

❋ যদি প্রতিদিন করা আপনার জন্য কষ্টকর হয়ে যায়, তাহলে প্রথমে না হয় সপ্তাহে একদিন করেই এই সুন্নাহ পালন করা শুরু করুন।

[১৬৭] দারসুল শায়খ আয়েদ আল কারনি : ১৮/১৭

[১৬৮] সুনান আত-তিরমিযী, হাদিস নং : ৫৮৬

❋ প্রয়োজনে সাথে এমন একজনকে নিয়ে যান, যে কিনা আপনাকে এই সুন্নাহ পালনে সহায়তা করবে।

❋ এ সময়ে এ কয়টি কাজ খুব মন দিয়ে করুন :

❖ কুরআন পড়া।

❖ আল্লাহ তা'আলার যিকির করা।

❖ বিভিন্ন দু'আ পড়া।

❖ সকালের যিকিরগুলো করা।

❖ জীবনের উদ্দেশ্য নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করা, কুরআন নিয়ে ভাবা।

❋ সূর্যোদয়ের ১৫ মিনিট বা তারচেয়ে একটু পরে দুই রাকাত (সম্ভব হলে এর চেয়ে বেশি) সালাত আদায় করুন।

ওপরের কাজগুলো করতে পারলে দেখবেন কীভাবে আপনার কঠিন হৃদয় আবার নরম হয়ে গেছে। আবার আপনি কুরআন পড়ে কাঁদতে পারছেন। দুনিয়ার সবকিছুর চাইতে আপনার রবকে বেশি ভালোবাসতে পারছেন।

ভালোবাসার সে অনুভূতি কোটি কোটি টাকা দিয়েও কেনা সম্ভব নয়।

বাড়িতে বাড়িতে মসজিদ

যে সুন্নাহটির কথা এখন বলব, সেটার কথা আজ প্রায় সবাই-ই ভুলে গিয়েছে। অনেকে হয়তো এমন সুন্নাহ আছে জেনেই অবাক হয়ে যাবে। এ সুন্নাহটি হচ্ছে বাড়ির একটি অংশ সালাতের জন্য নির্দিষ্ট করে ফেলা। বাড়ির মধ্যেই একটি মসজিদ বানিয়ে ফেলা।

আয়েশা ﵂ বলেন,

أَمَرَ رَسُولُ اللَّـهِ صلى الله عليه وسلم بِبِنَاءِ الْمَسَاجِدِ فِي الدُّورِ وَأَنْ تُنَظَّفَ وَتُطَيَّبَ

"রাসূল ﷺ আমাদের বাড়িতে বাড়িতে মসজিদ বানাতে বলতেন। আর সে মসজিদকে পরিষ্কার ও সুবাসিত রাখতে বলতেন।"[১৬৯]

কোনো কোনো আলেম বলেছেন, এ হাদিসে الدُّورِ বলতে কারও অঞ্চলকে বোঝানো হয়েছে। অন্যরা বলেছেন, এটি দিয়ে বাড়িকেই বোঝানো হয়েছে।

দ্বিতীয় মতটিকে ইতবান ইবনে মালিক ﵁-এর এই হাদিসটি[১৭০] সমর্থন জানাচ্ছে। তিনি বলেন,

"একদিন আমি রাসূল ﷺ-এর কাছে গেলাম। বললাম, 'আমার চোখের দৃষ্টি কমে গেছে। কখনো কখনো বন্যার পানির কারণে আমার মসজিদে যেতে

---

[১৬৯] আবু দাউদ, হাদিস নং : ৪৫৫

[১৭০] ওপরের হাদিস এবং নিচের হাদিস এর ক্ষেত্রে আলাদা।-শার'ঈ সম্পাদক

খুব সমস্যা হয়। তাই আমার ইচ্ছা, আপনি যদি আমার বাসায় এসে সালাত আদায় করতেন, তবে আমি পরবর্তী সময় ওই জায়গাটিকে আমার সালাতের স্থান বানিয়ে ফেলতাম।”

তার এই বিনীত অনুরোধে রাসূল ﷺ সাড়া দিয়ে বললেন,

أَفْعَلُ إِنْ شَاءَ اللَّـهُ

‘ইন শা আল্লাহ! আমি এটা করব।’[১৭১]

ইবনে মালিক رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ এরপর বলেন,

“পরদিন রাসূল ﷺ আবু বকর رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ-কে সাথে নিয়ে আমার বাসায় এলেন। সূর্য তখন আগুন ছড়াচ্ছে। তিনি ভেতরে প্রবেশের অনুমতি চাইলে আমি তাঁকে। অনুমতি দিলাম। তিনি না বসেই জিজ্ঞেস করলেন,

أَيْنَ تُحِبُّ أَنْ أُصَلِّيَ مِنْ بَيْتِكَ؟

“আমি কোথায় সালাত পড়লে তুমি খুশি হবে?”

আমি তাঁকে একটি নির্দিষ্ট জায়গা দেখিয়ে দিলাম। তিনি সেখানে সালাত আদায় করলেন। আর আমরা তাঁর পেছনে সালাত আদায় করলাম।”[১৭২]

আবু বকর رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ-ও এই সুন্নাহ অনুসরণ করতেন। তাঁর কন্যা আয়েশা رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا বলেছেন,

ثُمَّ بَدَا لأَبِي بَكْرٍ، فَابْتَنَى مَسْجِدًا بِفِنَاءِ دَارِهِ وَبَرَزَ، فَكَانَ يُصَلِّي فِيهِ، وَيَقْرَأُ الْقُرْآنَ

“তারপর আবু বকর رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ নিজের বাড়ির চত্বরে সালাতের জন্য একটি জায়গা বানালেন। তিনি সেখানে সালাত আদায় করতেন আর কুরআন তিলাওয়াত করতেন।”[১৭৩]

আমি জানি অনেকেই মনে মনে বলছেন, “আমাদের বাসা তো অনেক ছোট!

[১৭১] সহীহ বুখারি, হাদিস নং : ৬৮৬
[১৭২] সহীহ বুখারি, হাদিস নং : ৬৮৬
[১৭৩] সহীহ বুখারি, হাদিস নং : ৪৭৬

আমাদের বাসায় এমন জায়গা কীভাবে বানাব?”

যতটুকু জায়াগা আলাদা করবেন তা যে আপনার বাসা থেকে আলাদা হতে হবে কিংবা সম্পূর্ণ পৃথক একটা রুমকে সালাত পড়ার জন্য বরাদ্দ করতে হবে এমন কোনো কথা নেই; বরং বাসার মধ্যে সামান্য একটু জায়গা আলাদা করলেই হবে। সেখানে সবাই শুধু সালাত পড়বে। দেখতে যাতে ভালো দেখায় এ জন্য চাইলে আপনি কার্পেট কিংবা মাদুর বিছিয়ে দিতে পারেন। অবশ্যই খেয়াল রাখবেন, জায়গাটা যেন সব সময় পরিষ্কার থাকে। সুবাসিত থাকে। যেন চাইলেন আপনি সেখানে কুরআন নিয়ে বসে যেতে পারেন। নফল সালাত পড়তে পারেন। আর রাসূল ﷺ আমাদের নফল সালাত ঘরে পড়তে উৎসাহিত করেছেন।[১৭৪]

যারা শারীরিক অসুস্থতার কারণে মসজিদে সালাত আদায় করতে পারছেন না, তারা এখন চাইলেই সেখানে সালাত আদায় করতে পারবেন। বাড়ির মেয়েদেরও এখন আর সালাতের জায়গা নিয়ে চিন্তা করতে হচ্ছে না। পরিবারের সবাই একসাথে বসে সেখানে কুরআন পড়তে পারেন। হাদিসের কোনো বই থেকে কিছু অংশ প্রতিদিন সেখানে পড়া যেতে পারে।

সবচেয়ে বড় কথা বাসার সবাই এতে করে সালাতের গুরুত্ব বুঝতে পারবে। সবার মধ্যে সালাতের প্রতি ভালোবাসা সৃষ্টি হবে। হয়তো আপনার বাড়িতে সালাতের এত সুন্দর ব্যবস্থা দেখে অনেকে নিজের বাসাতেও এমন একটা জায়গা বানাতে চাইবে।

মধ্যরাতের সুনসান নীরবতায় কিছু ঘর নূরের আলোয় আলোকিত হয়ে যাবে।

---

[১৭৪] সহীহ বুখারি, হাদিস নং : ৪৩২

জীবন বদলে দেয়া কথা

যায়েদ ইবনে সাবিত ﷺ। খুব কম বয়সেই তিনি কুরআনের বেশ কয়েকটি সূরা মুখস্থ করে ফেলেছিলেন। অল্প বয়সেই তার মেধা ছিল বেশ তীক্ষ্ণ। রাসূল ﷺ তার ভেতরের প্রতিভা খুব ভালোভাবে বুঝতে পেরেছিলেন। তাই তিনি তাকে বললেন,

يَا زَيْدُ، تَعَلَّمْ لِي كِتَابَ يَهُودَ

"যায়েদ! আমি চাই তুমি আমার জন্য ইহুদিদের ভাষাটা শিখবে।"

ভালোভাবে একটা ভাষা পড়তে-লিখতে অনেক মেধাবী লোকেরও বছর খানেক লেগে যায়। যায়েদ ﷺ-এর ক'বছর লেগেছিল? তিনি নিজেই এ ব্যাপারে বলেছেন,

"আমি তাদের ভাষা শিখে ফেলেছিলাম। সে ভাষা শিখতে আমার মাত্র পনেরো দিন লেগেছিল। তখন ইহুদিরা রাসূল ﷺ-এর কাছে কোনো চিঠি পাঠালে তা আমি তাঁকে পড়ে শোনাতাম। আবার তিনি ইহুদিদের কাছে কোনো চিঠি পাঠালে আমি তা লিখে দিতাম।"[১৭৫]

রাসূল ﷺ এভাবেই তাঁর কাছের মানুষদের থেকে সেরাটা বের করে নিতে পারতেন। তাদের প্রতিভাকে চিনতে পারতেন। সে প্রতিভার বিকাশে সাহায্য করতেন। চাইলে এমন অসংখ্য উদাহরণ দেয়া যায়।

কিছু কিছু স্মৃতি আমরা কখনোই ভুলি না। ভুলতে পারি না। সে স্মৃতি আনন্দের

---

[১৭৫] মুসনাদে আহমাদ, হাদিস নং : ২১৬১৮

হতে পারে। আবার কষ্টেরও হতে পারে। ধরা যাক সামান্য ভুলের কারণে আপনার শিক্ষক আপনাকে সবার সামনে ছোট করলেন। সবাই আপনাকে নিয়ে হাসাহাসি করল। অনেক বড় হয়ে যাবার পরেও সে স্মৃতি আপনাকে তাড়া করে বেড়াবে।

আবার ধরা যাক সামনে পরীক্ষা। আপনি প্রচণ্ড মেধাবী। কিন্তু ব্যক্তিগত কিছু কারণে ভালোভাবে পড়াশোনা করতে পারেননি। স্যার আপনাকে ডেকে নিয়ে বললেন, "এ কয়দিন ভালো করে পড়ো। আমার তোমার প্রতি বিশ্বাস আছে। তুমি ঠিকই ভালো করবে।" সামান্য এ কথাই আপনাকে প্রচণ্ড অনুপ্রেরণা দিলো। দেখা গেল রেজাল্ট অন্য যেকোনো বারের চেয়ে অনেক ভালো হয়েছে।

ঠিক জায়গায় ঠিক কথা বলতে পারলে মানুষের মনে তা অনেক প্রভাব ফেলে। তাই এখন থেকে পরিবারের খাবার টেবিলে, বন্ধুদের সাথে রেস্টুরেন্টে, এমনকি অনলাইনেও কারও মধ্যে কোনো প্রতিভা দেখতে পেলে তাকে প্রেরণা দিন। চেষ্টা করুন তার এই প্রতিভাকে যেন সে আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টিতে ব্যয় করতে পারে। দুনিয়ার সাথে সাথে আখিরাতটাকেও গোছাতে পারে। দেখবেন আপনার সামান্য কথা দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে সে অনেক বড় কিছু করে ফেলেছে। সেটা আপনি তো বটেই সে নিজেও কখনো কল্পনা করতে পারেনি। ইতিহাস থেকে এমন দুটি উদাহারণ দিচ্ছি :

ইমাম যাহাবী ﵀-এর উস্তাদ ছিলেন শায়খ বিরযালি ﵀। একদিন তিনি যাহাবী ﵀-কে উদ্দেশ্য করে বললেন,

إن خطك يشبه خط المحدثين

"তোমার হাতের লেখা তো দেখি মুহাদ্দিসদের মতো।"

যাহাবী ﵀ বলেন,

فحبب الله إليّ علم الحديث

"সেদিন থেকে আল্লাহ আমার অন্তরে হাদিসের প্রতি ভালোবাসা ঢেলে দিলেন।"[১৭৬]

---

[১৭৬] আরশি'ফু মুলতাকা আহলিল হাদিস : ৩, ১৯/১৪৪

ইমাম যাহাবী ﷺ এরপর বেশ কয়েকটি বই লিখে গেছেন। যে বইগুলো ছাড়া আজ আমাদের লাইব্রেরি অপূর্ণ থেকে যায়। জ্ঞানতৃষ্ণা অপূর্ণ রয়ে যায়।

ইমাম বুখারি ﷺ। তার নাম সামনে এলেই আমাদের সহীহ বুখারির কথা মনে পড়ে যায়। অথচ শুরুতে তিনি নিজেই জানতেন না যে, তিনি এত অসাধারণ একটি বই লিখবেন। যে বইকে আমরা মুসলিমরা কুরআনের পর সবচেয়ে নির্ভুল গ্রন্থ বলি। কীভাবে তিনি এ বই লেখা শুরু করেছিলেন সেটার গল্প বলতে গিয়ে ইমাম বুখারী ﷺ বলেন,

> "আমরা ইসহাক ইবনে রাহওয়িয়াহর সাথে বসে ছিলাম। একসময় তিনি আমাকে বললেন, 'তুমি কেন রাসূল ﷺ-এর সহীহ হাদিসগুলো নিয়ে একটি সংক্ষিপ্ত বই লিখছ না?' সাথে সাথেই এ বইটা লেখার জন্য আমার অন্তরে দরদ সৃষ্টি হয়ে গেল। আমি বইটা সংকলন করা শুরু করলাম।"[১৭৭]

সে সময়ে ইমাম বুখারি ﷺ-এর বয়স কত ছিল জানেন? মাত্র ষোলো বছর। তিনি তার জীবনের বাকি ১৬ বছর এই অসাধারণ গ্রন্থ সংকলনের পেছনে ব্যয় করেন। যে অবিচল অধ্যবসায় আর নিষ্ঠার স্বাক্ষর তিনি এ বইতে রেখে গেছেন, তা আজীবন ইতিহাসের পাতায় লেখা থাকবে।

আজকের দিনে ইসলামের বিভিন্ন বিধি-বিধান জানার জন্য আমরা ইমাম বুখারি ﷺ-এর এই বইয়ের ওপর কতখানি নির্ভরশীল? অনেক। তিনি আমাদের জন্য একটি মুক্তোর ভান্ডার রেখে গেছেন। সে মুক্তো রাসূল ﷺ-এর পক্ষ থেকে। আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে। যতদিন ইসলাম থাকবে আমরা তার কথা স্মরণ করব। তার জন্য দু'আ করব। তিনি কবরে থেকে সে সওয়াব পেতে থাকবেন। আর আল্লাহ চাইলে যিনি এই অসাধারণ বইটি সংকলন করতে ইমাম বুখারি ﷺ-কে পরামর্শ দিয়েছিলেন, তাকেও আল্লাহ তা'আলা পুরস্কৃত করবেন।

সামান্য কিছু কথাই এভাবেই অসংখ্য মানুষের জীবন বদলে দিতে পারে। বদলে দিতে পারে বেঁচে থাকার মানেটা। জীবনের উদ্দেশ্যটা। সে এমন কিছু করে ফেলতে পারে, যা দ্বারা অসংখ্য মানুষ উপকৃত হবে। সাথে সাথে আপনার আমলনামাও ভারী হয়ে যেতে পারে।

---

[১৭৭] ফাতহুল বারি : ১/৭

কাছের মানুষদের নিয়েই প্রথমে শুরু করুন। তাদের প্রতিভাকে চিনুন। উৎসাহ দিন। প্রতিভার বিকাশ ঘটাতে সাহায্য করুন। মুখ দিয়ে সামান্য কথা বলতে আপনার তেমন কষ্টই হবে না। কোনো টাকাও লাগবে না।

কিন্তু সামান্য এই কথাই সেই মানুষটার জীবন বদলে দেবে।

বাড়িতে ফেরার আগে

মসজিদ হচ্ছে প্রশান্তির জায়গা। এ দুনিয়ার নোংরামি থেকে মসজিদ আমাদের ক্ষণিকের জন্য মুক্তি দেয়। এখানে ফেরেশতারা আসে। পৃথিবীর সব দুয়ার থেকে নিরাশ হয়ে অসহায় মানুষরা এখানেই আশ্রয় চায়। তাঁর কাছেই চায়, যার ভান্ডার কখনো শেষ হয় না। মসজিদ হচ্ছে আল্লাহর নিকট সবচেয়ে প্রিয় স্থান। এখানে যারা আসে সবাই তাঁর অতিথি। তাই তো ঘরে-অফিসে নানা কাজে ব্যস্ত থাকলেও একজন মুমিনের অন্তর সব সময় মসজিদের সাথে লেপ্টে থাকে।

রাসূল ﷺ বলেছেন,

مَنْ تَوَضَّأَ فِي بَيْتِهِ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ، ثُمَّ أَتَى الْمَسْجِدَ، فَهُوَ زَائِرُ اللهِ، وَحَقٌّ عَلَى الْمَزُورِ أَنْ يُكْرِمَ الزَّائِرَ

"যে বাসায় যথাযথভাবে ওযু করে, তারপর মসজিদে সালাত পড়তে যায়; সে আল্লাহর অতিথি হয়ে যায়। আর এটা কর্তার দায়িত্ব যে, সে অতিথিকে সম্মান করবে।"[১৭৮]

রাসূল ﷺ কোনো সফর শেষে সর্বপ্রথম মসজিদে যেতেন। কাব ইবনে মালিক رضي الله عنه বলেন,

وَكَانَ إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ، بَدَأَ بِالْمَسْجِدِ، فَيَرْكَعُ فِيهِ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ جَلَسَ لِلنَّاسِ

---

[১৭৮] তাবারানী, হাদিস নং : ৬১৩৯

"কোনো সফর থেকে আসার পর, রাসূল ﷺ প্রথমে মসজিদে গিয়ে দুই রাকাত সালাত আদায় করতেন। তারপর লোকজনের সাথে বসতেন।"[১৭৯]

সাহাবিদেরও তিনি একই কাজ করতে বলতেন। জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ رضي الله عنه একবার সফর শেষে ফিরে আসার পর রাসূল ﷺ তাকে বলেছিলেন,

ائت المسجد فصل فيه ركعتين

"মসজিদে গিয়ে দুই রাকাত সালাত পড়ে নাও।"[১৮০]

আর আমরা কী করি? লম্বা জার্নি শেষে বাসায় এসে এক-দুই সপ্তাহের জন্য মসজিদ থেকে উধাও হয়ে যাই। কেউ মসজিদে যেতে বললে বলি :

- "জার্নি করে প্রচণ্ড টায়ার্ড হয়ে গেছি।"
- "কেবলই তো এলাম। একটু রেস্ট নিয়ে নিই।"
- "আর বলো না! সারা শরীর ম্যাচম্যাচ করছে।"
- "আরে আগে তো ফ্রেশ হয়ে নিই। তারপর না মসজিদে যাব।"

তবে রাসূল ﷺ আর সাহাবিরা কিন্তু কোনো অজুহাত দাঁড় করাতেন না। তারা লম্বা সফর শেষে সরাসরি মসজিদে চলে যেতেন। মরুভূমির তপ্ত বুকে কখনো হেঁটে, কখনো উটের পিঠে চড়ে তারা অনেক ক্লান্ত হয়ে যেতেন। এত ক্লান্তিও তাদের দুই রাকাত সালাত আদায় করা থেকে বিরত রাখতে পারত না। আমাদের যোগাযোগব্যবস্থা তো সে সময়ের তুলনায় অনেক ভালো। তাদের তুলনায় আমাদের কোনো কষ্টই হয় না। তাহলে আমরা পারব না কেন?

এ সুন্নাহ অনেকটা রুলারের মতো। এটি আমাদের জানিয়ে দেয়, আসলেই কি আমরা রাসূল ﷺ-এর সুন্নাহকে ভালোবাসি? নাকি পছন্দ হলে মানি আর কষ্ট হলে বাদ দিই?

---

[১৭৯] সহীহ বুখারি, হাদিস নং : ৪৪১৮
[১৮০] আবু দাউদ, হাদিস নং : ১৮৩৩

ঝগড়া মিটিয়ে দেয়া

গলায় গলায় ভাব। একজন আরেকজনকে ছাড়া চলেই না। তারপর একদিন হুট করে তুচ্ছ একটা বিষয় নিয়ে ঝগড়া। ব্যস! কথা বলা বন্ধ। বন্ধ মুখ দেখাদেখিও। একজন ডানে গেলে আরেকজন যায় বাঁয়ে।

এমন অবস্থা কার জীবনে আসেনি? দশজনের মধ্যে নয়জনই বলবে তাদের এই তিক্ত অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে যেতে হয়েছে। সেটা হতে পারে স্বামীর সাথে স্ত্রীর, বাবার সাথে ছেলের, ভাইয়ের সাথে বোনের, বন্ধুর সাথে বন্ধুর। আমরা নিজেরাই সম্পর্কের এই টানাপোড়েনে পড়েছি। কিংবা কাউকে না-কাউকে এ নাজুক অবস্থার মধ্যে দিয়ে যেতে দেখেছি।

একজন মুসলিম হিসেবে আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য কী? এককথায় ক্ষণস্থায়ী দুনিয়ার পরীক্ষায় ভালোভাবে পাশ করে চিরস্থায়ী জান্নাত অর্জন করা। সে অর্জনের সামনে আজ কত বাধা আমাদের সামনে রয়েছে :

- অন্তরে নিষ্ঠার অভাব।
- যশাকাঙ্ক্ষা।
- অলসতা।
- ইবাদতে অনীহা।
- আত্মতুষ্টি।
- অহংকার।
- গোপনে গুনাহে লিপ্ত হয়ে পড়া।

তবে পাহাড়সম গুনাহ থাকার পরেও ভয়ের সাথে সাথে আমরা আশা করতে পারি, আল্লাহ তা‘আলা আমাদের মাফ করে দেবেন।[১৮১] কিন্তু শুধু ঝগড়ার কারণে যদি আল্লাহ তা‘আলা আমাদের ক্ষমা না করেন তবে আমাদের জন্য আখিরাতের পরীক্ষায় পাশ করা অনেক কঠিন হয়ে পড়বে। রাসূল ﷺ বলেছেন,

تُعْرَضُ الأَعْمَالُ فِي كلِّ اثْنَيْنِ وَخَمِيسٍ، فَيَغْفِرُ اللهُ لِكُلِّ امْرِئٍ لا يُشْرِكُ باللهِ شَيْئًا، إِلاَّ امْرَءًا كَانَتْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أخِيهِ شَحْنَاءُ، فَيقُولُ: اتْرُكُوا هذَيْنِ حَتَّى يَصْطَلِحَا

“প্রত্যেক সোম ও বৃহস্পতিবার আমলসমূহ আল্লাহর কাছে পেশ করা হয়। আর আল্লাহর সাথে শরীক করেনি এমন সবাইকে ক্ষমা করে দেয়া হয়। তবে সেই ব্যক্তিকে নয়, যার সাথে তার অন্য মুসলিম ভাইয়ের শত্রুতা থাকে। (তাদের সম্পর্কে) বলা হয়, ‘এই দুইজনকে (ক্ষমা করা হবে) না, যতক্ষণ পর্যন্ত তারা মিটমাট না করে’।”[১৮২]

এ জন্যেই ঈমানদারদের একটি দল সব সময় মুসলিম ভাইদের মধ্যে চলা বিবাদ মেটানোর চেষ্টা করে এসেছেন। তারা বুঝতে পেরেছিলেন সালাত, সিয়াম এবং সদকার চেয়েও এ কাজটি বেশি উত্তম। কেননা, রাসূল ﷺ বলেছেন,

أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِأَفْضَلَ مِنْ دَرَجَةِ الصَّلَاةِ، وَالصِّيَامِ، وَالصَّدَقَةِ؟ قَالُوا: بَلَى قَالَ: إِصْلَاحُ ذَاتِ الْبَيْنِ

“আমি কি তোমাদের বলব না কোন কাজটি সালাত, সিয়াম এবং সদকার চেয়েও ভালো? তারা বলল, ‘জি, বলুন।’ রাসূল ﷺ বললেন, ‘সেটা হচ্ছে মানুষের মধ্যকার বিবাদ মিটিয়ে দেয়া’।”[১৮৩]

রাসূল ﷺ একে সদকার সাথে তুলনা করেছেন। তবে এ সদকা করতে কোনো টাকার প্রয়োজন পড়বে না—

---

[১৮১] রাসূল ﷺ বলেছেন, “আল্লাহ তা‘আলা বলেন, ‘হে আদমসন্তান, যতক্ষণ তুমি আমাকে ডাকবে এবং ক্ষমার আশা রাখবে, ততক্ষণ আমি তোমাকে ক্ষমা করব। তোমার অবস্থা যা-ই হোক না কেন, আমি কোনো পরোয়া করি না। হে আদমসন্তান, তোমার গুনাহ যদি আকাশ ছুঁয়ে যায়, আর তারপর তুমি আমার নিকট ক্ষমা চাও, আমি তোমাকে ক্ষমা করে দেবো। আমি কোনো পরোয়া করি না। হে আদমসন্তান, তুমি যদি পৃথিবীসম গুনাহ নিয়ে আমার কাছে আসো এবং আমার সাথে কাউকে শরীক না করে থাকো, তাহলে আমি পৃথিবী পরিমাণ ক্ষমা নিয়ে তোমার নিকট উপস্থিত হব।” (সুনানে তিরমিযী, হাদিস নং : ৩৫৪০)

[১৮২] সহীহ মুসলিম, হাদিস নং : ২৫৬৫

[১৮৩] মুসনাদে আহমাদ, হাদিস নং : ২৭৫০৮

أفضل الصدقة إصلاح ذات البين

"সবচেয়ে উত্তম সদকা হচ্ছে মানুষের বিবাদ মিটিয়ে দেয়া।"[১৮৪]

রাসূল ﷺ যখন শুনেছিলেন, কুবা এলাকার লোকেরা বিবাদে লিপ্ত হয়ে একে অন্যের দিকে পাথর ছুড়ে মারছে, তিনি সাথে সাথেই বলেছিলেন,

اذهبوا بنا نصلح بينهم

"চলো সেখানে যাই আর তাদের মধ্যকার বিবাদ মিটিয়ে দিই।"[১৮৫]

কারও মধ্যে ঝগড়া হলে আমরা কী করি? দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তামাশা দেখি, মজা নিই, কার দোষ বেশি তা নিয়ে আরেকজনের সাথে গল্প করি। তবে রাসূল ﷺ আর তাঁর সাহাবারা ছিলেন আমাদের চেয়ে অনেক আলাদা। তাঁরা কথা বলতেন খুব কম কিন্তু করে দেখাতেন অনেক বেশি। কখনো ভেবে দেখেছেন :

➢ শয়তানের কতগুলো চক্রান্ত তাঁরা নস্যাৎ করেছেন?

➢ কত ভাঙা ঘর তাঁরা জোড়া লাগিয়েছেন?

➢ কত মানুষের দু'আ তাঁরা অর্জন করেছেন?

➢ মানুষকে এ মহৎ কাজের দিকে আহ্বান করে কী পরিমাণ সওয়াব তাঁরা অর্জন করেছেন?

তাই আজ থেকেই কাজে লেগে পড়ুন। মানুষ বিবাদ মেটানোর সাধ্যমতো চেষ্টা করুন। এ বিবাদ হতে পারে স্বামীর সাথে স্ত্রীর, ভাইয়ের সাথে বোনের, সন্তানের সাথে বাবা-মায়ের। চিন্তা করুন কীভাবে তাদের এই বিবাদ মিটিয়ে ফেলা যায়। প্রয়োজনে :

➢ এমন কয়েকজনের সাথে কথা বলুন যারা কাজটি করতে আগ্রহী হবে।

➢ আগ্রহীদের নিয়ে একটি দল বানিয়ে ফেলুন।[১৮৬]

➢ কীভাবে বিবাদ মেটানো যাবে তা নিয়ে সবাই গভীরভাবে ভাবুন।

---

[১৮৪] তাবারানী, হাদিস নং : ৬৯

[১৮৫] সহীহ বুখারি, হাদিস নং : ২৬৯৩

[১৮৬] সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠায় রাসূল ﷺ 'হিলফুল ফুজুল' নামে একটি দলের সাথে যুক্ত ছিলেন। চেষ্টা করে দেখুন, বৃহৎ পরিসরে আপনারাও তেমন কিছু করতে পারেন কি না!

➢ আল্লাহর কাছে দু'আ করুন যেন তিনি বিবাদী দুই পক্ষের মনটাকে নরম করে দেন।

সবশেষে আল্লাহর কাছে চান, তিনি যেন আপনাদের এই ভালো কাজটি কবুল করে নেন। সালাত, সিয়াম আর সদকার চেয়েও উত্তম এই আমলের জন্য আখিরাতে আপনাদের পুরস্কৃত করেন।

সকল উত্তম প্রতিদান তো রয়েছে তাঁর নিকটেই।

মাঝরাতের দুঃস্বপ্ন ঠেকাতে

সবচেয়ে ক্ষমতাধর দেশ হিসেবে আমরা হয়তো ভাবি আমেরিকার মানুষরা সবচেয়ে সুখী জীবনযাপন করে। তবে *'Anxiety and Depression Association of America'*-এর একটি রিপোর্ট অনুযায়ী, প্রায় ৪ কোটি আমেরিকান দীর্ঘমেয়াদি বিভিন্ন নিদ্রাজনিত অসুখে ভুগছে। আর ২ কোটি মানুষ অভিযোগ করেছে, তারা ঘুমের সময় নানা তিক্ত অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হয়।[১৮৭]

আসলেই ঘুমের জগৎটা খুব রহস্যময়। বাস্তবতার সাথে এর লেনা-দেনা কতই-না কম! আল্লাহ তা'আলা তাই কুরআনে মৃত্যু আর ঘুমকে পাশাপাশি উল্লেখ করেছেন।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ لِيُقْضَىٰ أَجَلٌ مُسَمًّى ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

"তিনিই রাতে তোমাদের মৃত্যু দেন আর যা কিছু তোমরা দিনের বেলায় করো, তা জানেন। তারপর তিনি তোমাদের দিনে আবার জাগিয়ে তোলেন, যাতে নির্দিষ্ট মেয়াদ পূর্ণ হয়। তারপর তাঁর দিকেই তোমাদের প্রত্যাবর্তন।

[১৮৭] https://adaa.org/understanding-anxiety/related-illnesses/sleep-disorders

তখন তোমরা যা করতে সে বিষয়ে তিনি তোমাদের জানিয়ে দেবেন।"[১৮৮]

ইমাম কুরতুবি ﷺ এ বিষয়ে বলেন,

النوم والموت يجمعهما انقطاع تعلق الروح بالبدن

"ঘুম আর মৃত্যুর মধ্যে মিল রয়েছে। এ দুই অবস্থায় দেহ থেকে রূহ আলাদা হয়ে যায়।"[১৮৯]

ঘুমের জগৎ নিয়ে আমাদের ধারণা খুব একটা পরিষ্কার না। কিন্তু এটা আমরা সহজেই বুঝতে পারি, জেগে থাকার চেয়ে ঘুমিয়ে থাকার সময়েই আমরা বেশি শয়তানের আক্রমণ শিকার হই। শয়তান আমাদের এমন কিছু দেখাতে পারে, করাতে পারে—বাস্তবে যা করা আমাদের জন্য কখনো কখনো খুবই লজ্জার, কখনো কখনো ঘৃণার। এ জন্য অনেকেই ঘুম নিয়ে বিভিন্ন সমস্যার কথা অভিযোগ করে থাকেন।[১৯০] কেউ দুঃস্বপ্নের কথা বলেন। কেউ বা বলেন বোবায় ধরার তিক্ত অভিজ্ঞতার কথা। কেউ কেউ আবার ডাক্তার-কবিরাজদের কাছে ওষুধের জন্য দৌড়াদৌড়ি করে। অথচ আমরা অনেকেই রাসূল ﷺ-এর একটি সুন্নাহর কথা ভুলে যাই।

সেটা হচ্ছে ঘুমানোর আগে ওযু করার সুন্নাহ। এর উপকারিতার কথা বলতে গিয়ে ইবনে হাজার ﷺ লিখেছেন,

"(প্রথমত) পবিত্র হয়ে ঘুমের সময় সে মারা গেলে, সে পরিপূর্ণ অবস্থাতেই থাকবে। (দ্বিতীয়ত) ওযু অবস্থায় ঘুম আমাদের সত্য স্বপ্ন দেখায় আর

---

[১৮৮] সূরা আন'আম, ৬ : ৬০
রাসূল ﷺ আল্লাহর নিকট এই বলে দু'আ করতেন,

الحَمْدُ لِلَّـهِ الَّذِي أَحْيَانَا بَعْدَ مَا أَمَاتَنَا وَإِلَيْهِ النُّشُورُ

"সকল প্রশংসা আল্লাহ তা'আলার যিনি মৃত্যুর পর আমাদের আবার জীবিত করেছেন। আর তাঁর দিকেই আমাদের প্রত্যাবর্তন।" (সহীহ বুখারি, হাদিস নং : ৬৩১২)

[১৮৯] ফাতহুল বারি : ১১/১১৪
ইবনে হাজার ﷺ উল্লেখ করেছেন, "ঘুমকে মৃত্যু বলা হয়। কেউ যখন ঘুমায়, তখন সে চিন্তা করতে পারে না, নড়াচড়াও করতে পারে না। এটা তো মৃত্যুর মতোই।" (ফাতহুল বারি : ১১/১১৪)

[১৯০] এক পরিসংখ্যানে উঠে এসেছে, অন্যান্য দেশের তুলনায় বাংলাদেশের মানুষই নিদ্রাজনিত সমস্যায় সবচেয়ে বেশি ভোগে। এ দেশের শতকরা প্রায় ৪২ ভাগ নারী এ সমস্যায় ভুগে থাকে। পুরুষদের ক্ষেত্রে যদিও তা অপেক্ষাকৃত কম (প্রায় ২৪ শতাংশ), তবে একেবারে উড়িয়ে দেয়ার মতো না।

▪https://warwick.ac.uk/newsandevents/pressreleases/global_145sleeplessness_epidemic146/

শয়তানের ফাঁদ থেকে রক্ষা করে।”[১৯১]

এর উপকারিতা এখানেই শেষ না। রাসূল ﷺ বলেছেন,

مَنْ بَاتَ طَاهِرًا بَاتَ فِي شِعَارِهِ مَلَكٌ فَلَمْ يَسْتَيْقِظْ إِلَّا، قَالَ الْمَلَكُ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِعَبْدِكَ فُلَانٍ، فَإِنَّهُ بَاتَ طَاهِرًا

“যদি কেউ রাতের বেলা পবিত্র অবস্থায় ঘুমোতে যায়, তবে একজন ফেরেশতা তার কাছে আসে। রাতে সে যখনই ঘুম থেকে ওঠে ফেরেশতা তখন বলে, ‘হে আল্লাহ, আপনার এই বান্দাটিকে মাফ করে দিন। কেননা, সে পবিত্র হয়ে ঘুমোতে গিয়েছে।’”[১৯২]

কাছের মানুষদের দিয়েই শুরু করুন। বাসার সবাইকে ওযু অবস্থায় ঘুমানোর তাগিদ দিন। দেখবেন মাঝরাতে আপনাকে আর “বাঁচাও! বাঁচাও! পানি! পানি!” চিৎকার শুনতে হচ্ছে না। পানির জন্য দৌড়াতেও হচ্ছে না।

---

[১৯১] ফাতহুল বারি : ১১/১১০
[১৯২] ফাতহুল বারি : ১১/১১০

আলাপ শেষে

আমরা এমন এক সমাজে বাস করি যে, চাইলেও সব সময় দীনি পরিবেশে থাকা সম্ভব না। জীবনে চলার বাঁকে বিভিন্ন ধর্মের, বর্ণের, চরিত্রের মানুষের সাথে আমাদের মিশতে হয়। কথা বলতে হয়। আর তাই সবার সাথে আমাদের অভিজ্ঞতাও এক রকম হয় না। আলাপচারিতায় ইচ্ছায়-অনিচ্ছায় আমাদের শুনতে হয় পরনিন্দা, অহেতুক কথাবার্তা। কখনো কখনো খুবই অশ্লীল ও কুরুচিপূর্ণ কথা শুনে মনটা ভারী হয়ে যায়। দুঃখের ব্যাপার, মাঝে মাঝে আমরা নিজেরাও মুখ ফসকে অযাচিত কথা বলে ফেলি। তারপর অনুশোচনায় ভুগি। এমন সময় নষ্ট করা মজলিস থেকে ওঠার পর আমরা অনুভব করি আমাদের অন্তরটা কেমন যেন কঠিন হয়ে গেছে। আগের মতো আর আল্লাহভীতি কাজ করছে না।

তবে আশা করা যায়, এই সুন্নাহটি অনুসরণ করলে আমরা অন্তরের কাঠিন্য থেকে মুক্তি পাব। রাসূল ﷺ বলেছেন,

“যে কেউ এমন মজলিসে বসে, যাতে খুব বেশি হৈ-হুল্লোড় হয়,তারপর সে মজলিস ত্যাগ করার সময় বলে,

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، أَشْهَدُ أَنْ لاَّ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ

‘প্রশংসার সাথে তোমার পবিত্রতা বর্ণনা করছি হে আল্লাহ, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, তুমি ছাড়া কোনো সত্য ইলাহ নেই। আমি তোমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি আর তোমার দিকেই প্রত্যাবর্তন করছি।’

তবে সে মজলিসে করা গুনাহের জন্য তাকে ক্ষমা করে দেয়া হয়।"[১৯৩]

হয়তো এখন আমরা বুঝতে পারছি, কেন রাসূল ﷺ পবিত্র জবানে এই দু'আ সব সময় লেগে থাকত।

আমাদের মা আয়েশা رضي الله عنها তাই বলেছেন,

مَا جَلَسَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَجْلِسًا قَطُّ، وَلَا تَلَا قُرْآنًا، وَلَا صَلَّى صَلَاةً إِلَّا خَتَمَ ذَلِكَ بِكَلِمَاتٍ

"রাসূল ﷺ কোনো মজলিসে বসেছেন, কুরআন তিলাওয়াত করেছেন কিংবা সালাত আদায় করেছেন অথচ এই দু'আ পড়েননি এমনটা কখনোই হয়নি।"[১৯৪]

আয়েশা رضي الله عنها রাসূল ﷺ-কে এভাবে দু'আ পড়ার ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেছিলেন,

مَنْ قَالَ خَيْرًا خُتِمَ لَهُ طَابَعٌ عَلَى ذَلِكَ الْخَيْرِ، وَمَنْ قَالَ شَرًّا كُنَّ لَهُ كَفَّارَةً

"যে ভালো ভালো কথা বলেছে, এই দু'আ তার সেই ভালো কথাগুলোকে সিল করে দেবে। আর যে বাজে কথা বলেছে, এই দু'আ তার খারাপ কথাগুলোকে দূরে নিয়ে যাবে।"[১৯৫]

ভালো আমলগুলো যদি সিল করা হয় তবে তা আল্লাহর কাছে নেয়া হয়। আল্লাহ তা'আলা সে আমল কবুল করে নেন। আচ্ছা! একবার ভাবুন তো, আল্লাহ তা'আলার যিকিরের মজলিসে থেকেই যদি রাসূল ﷺ এভাবে আল্লাহ তা'আলার কাছে দু'আ করেন, তবে আমাদের জন্য এই দু'আ কতখানি প্রয়োজন?

- এটা হতে পারে রেস্টুরেন্টের খাবার শেষে ওঠার আগে।
- কোনো এক সন্ধ্যায় বাসায় সবার একসাথে গল্পগুজব শেষে।
- প্রতিদিন সালাত এবং কুরআন তিলাওয়াত শেষে।
- বন্ধুদের সাথে আড্ডা দেয়ার পরে।

[১৯৩] সুনানে তিরমিযী, হাদিস নং : ৩৪৩৩
[১৯৪] সুনানে নাসাঈ, হাদিস নং : ১০০৬৭
[১৯৫] নাসাঈ, হাদিস নং : ১০০৬৭

➢ সোশাল মিডিয়াতে চ্যাট শেষে।

এই সুন্নাহটি অনুসরণের চেষ্টা করুন। সবাইকে অনুসরণ করতে উৎসাহ দিন। আল্লাহ্ তা'আলাকে স্মরণ করে নিজের ভালো আমলগুলো কবুল করিয়ে নিন। খারাপ কথাগুলোকে এক ধাক্কায় পাঠিয়ে দিন বহুদূরে।

তাঁর ওপর ভরসা করা

দামি সম্পদ আমরা অবশ্যই রাস্তাঘাটে ফেলে রাখি না। বাসার মধ্যে আলমারিতে খুব ভালো করে তালা মেরে রেখে দিই। বেশি দামি হলে অনেকে ব্যাংকে রেখে দেয়। ব্যাংক থেকে কেউ নিতে পারবে না বলে তৃপ্তির ঢেকুর তোলে। তবে কিছু সম্পদ আছে আমরা যা কোথাও জমা করে রাখতে পারি না। আমাদের ভালোবাসার মানুষদের, সন্তানদের, জীবনসঙ্গীদের আমরা কোথায় রাখব? তারা তো আমাদের কাছেই সবচেয়ে ভালো থাকে। আমাদের দীনও তেমন একটি বিষয়। এটাকে কোনো ব্যাংক জমা করে রাখতে পারে না।

আমরা সবাই জানি, আল্লাহ তা'আলার একটি নাম হচ্ছে الحفيظ। (আল-হাফিয)। অর্থাৎ, যিনি সংরক্ষণ করেন। ভেবে দেখুন তো, আল্লাহ তা'আলা যদি আমাদের দীন সংরক্ষণের দায়িত্ব নিতেন, তবে কি আমাদের কোনো দুঃশ্চিন্তা থাকত? কিন্তু এমনটা কি সম্ভব? ইবনে উমার ﵁ বলছেন, সম্ভব। তিনি তার এক বন্ধুকে বিদায় দেয়ার সময় বলেছিলেন,

سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: قَالَ لُقْمَانُ الْحَكِيمُ: إِنَّ اللهَ إِذَا اسْتُودِعَ شَيْئًا حَفِظَهُ، وَإِنِّي أَسْتَوْدِعُ اللهَ دِيْنَكَ، وَأَمَانَتَكَ

"আমি রাসূল ﷺ-কে বলতে শুনেছি, লোকমান হাকিম বলেছেন, 'কেউ যদি কোনো কিছুতে আল্লাহর ওপর ভরসা করে, তবে আল্লাহ সেটার হিফাযত করেন।' আর তাই আমি তোমাদের দীন ও আমানত আল্লাহর ওপর ন্যস্ত করছি।"[১৯৬]

---

[১৯৬] নাসাঈ, হাদিস নং : ১০২৭৩

এ হাদিসটি দ্বারা যারা কোথাও দীর্ঘদিনের সফরে যাচ্ছে তাদের উপদেশ দেয়া যেতে পারে। কারণ, বাসায় সবার সামনে কোনো গুনাহ্ করার চেয়ে দূরে কোথাও গিয়ে গুনাহে লিপ্ত হয়ে পড়া অনেক সহজ। তবে আল্লাহর দীন শুধু মুসাফিরদের উপদেশ দিয়ে শেষ হয়ে যাবে এমনটা কখনোই নয়। আমাদের জেনে হয়তো ভালো লাগবে, আমরা যেকোনো কিছুতেই আল্লাহ্‌র ওপর চূড়ান্ত ভরসা করলে, তিনি অবশ্যই তা সংরক্ষণ করবেন। এ নিয়ে অবাক করা একটি কাহিনি রয়েছে।

তখন উমার ﵁-এর খিলাফতের সময়। একদিন উমার ﵁ এক লোককে তার ছেলেসহ দেখলেন। তিনি তাদের মধ্যকার সাদৃশ্য দেখে অবাক হয়ে গেলেন। লোকটি তখন বলল, "হে আমিরুল মুমিনীন! আল্লাহর কসম! ও যখন জন্ম নেয়, তখন ওর মা মৃত ছিল।" এ কথা শুনে উমার ﵁ অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "আমাকে বলো তো আসলে কী হয়েছিল?"

লোকটি তখন বলা শুরু করল, "ওর মা যখন গর্ভবতী তখন আমি সফরে যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছিলাম। সে আমাকে বলল, 'আমার এ অবস্থায় তুমি কেমন করে আমায় একা ফেলে যাচ্ছ?' আমি তাকে বললাম, 'তোমার গর্ভে যা আছে তার ব্যাপারে আমি আল্লাহকে ভরসা করছি।'

সফর শেষে আমি বাড়ি ফিরে এলাম। বাসায় এসে ওর নাম ধরে ডাকলাম কিন্তু কেউ সাড়া দিলো না। আমি জানতে পারলাম, ও আর বেঁচে নেই। কাঁদতে কাঁদতে ওর কবরের কাছে গেলাম।

সেদিন সন্ধ্যাবেলায় আমি আমার এক ভাইয়ের সাথে বসে ছিলাম। ওর কবরটা আমাদের সামনেই ছিল। হঠাৎ করে ওর কবরের দিকে তাকিয়ে আমার মনে হলো সেখানে আগুন জ্বলছে। আমি আমার ভাইকে এটা দেখালে ও বলল, 'আমরা তো এটা সে মারা যাওয়ার পর থেকেই দেখে আসছি।'

আমি বললাম, 'আল্লাহর কসম! সে খুবই ধার্মিক নারী ছিল। সব সময় নিজের পবিত্রতা বজায় রাখত। সালাত পড়ত, সিয়াম পালন করত।' তখনি বাসায় ফিরে গিয়ে আমার কুঠারটি নিয়ে তার কবরের কাছে এলাম। এসে দেখি, কবর আগে থেকেই খোলা। তাকিয়ে দেখলাম, আমার স্ত্রীর লাশ বসা অবস্থায় রয়েছে। আর আমার ছেলেটা ওর সামনে হামাগুড়ি দিচ্ছে। আর আমি শুনলাম আকাশ থেকে একটি কণ্ঠস্বর বলছে,

أيها المستودع ربه وديعته خذ وديعتك

'হে ভরসাকারী! তুমি তোমার রবের ওপর ভরসা করেছিলে। তোমার সম্পদ নিয়ে নাও।'

তাই আমি ছেলেটাকে কোলে তুলে নিলাম। আর সে সন্তানকেই আপনি এখন দেখতে পাচ্ছেন, হে আমিরুল মুমিনীন।"[১৯৭]

কোনো সন্দেহ নেই, আল্লাহ চাইলে তার স্ত্রীকেও হিফাযত করতে পারতেন। কিন্তু আল্লাহর পরিকল্পনা ছিল অন্যরকম। আর তাঁর করা সবকিছু যুক্তির আলোকে বোঝা সম্ভব না। বোঝা উচিতও না।

তাই আজ থেকে কোনো ব্যাংকের ওপর ভরসা না করে নিজের জীবনের সবকিছু দিয়ে আল্লাহর ওপর ভরসা করুন। এ কথাগুলো মুখস্থ করে ফেলুন। কোনো কিছু নিয়ে খুব দুঃশ্চিন্তায় পড়ে গেলে নিজেকে নিজেই শোনাবেন। কাউকে কোনো কিছু নিয়ে দুঃশ্চিন্তা করতে দেখলে তাকে এটা বলে সান্ত্বনা দেবেন। এই বিশ্বাস নিজের মধ্যে রাখবেন, আল-হাফিযের ওপর সত্যিই ভরসা করলে তিনি নিরাশ করেন না।

শায়খ আবদুর রহমান আস-সা'দি ﷺ বলেছেন, "আল-হাফিয তো তিনি যিনি তাঁর সকল সৃষ্টির হিফাযত করেন। তাঁর জ্ঞানে যা কিছু আছে, তিনি যা কিছু অস্তিত্বে এনেছেন, সবকিছুর হিফাযত তিনি করেন। তিনি তাঁর বান্দাকে গুনাহ থেকে রক্ষা করেন। বিপদ থেকে মুক্ত করেন। তিনি সকল অবস্থায় তাদের খেয়াল রাখেন।"[১৯৮]

وَمَنْ يَتَّقِ اللَّـهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّـهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّـهَ بَالِغُ أَمْرِهِ

"যে আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন করে, আল্লাহ তার জন্য (সমস্যা থেকে উদ্ধার পাওয়ার) কোনো না-কোনো পথ বের করে দেবেন। এবং তিনি তাকে এমন জায়গা থেকে রিযিক দেবেন যা সে কল্পনাও করতে পারবে না। যে আল্লাহর ওপর ভরসা করে, তার জন্য তিনিই যথেষ্ট। আল্লাহ নিজের কাজ সম্পূর্ণ করবেন-ই।"[১৯৯]

---

[১৯৭] তাবারানী, হাদিস নং : ৮২৪

[১৯৮] তাফসীরে সাদি : ১/৯৪৭

[১৯৯] সূরা আত-ত্বলাক, ৬৫ : ২-৩

কবরস্থানে যাওয়া

এখন চাইলেও একা থাকা খুব কঠিন। স্মার্টফোন, ইন্টারনেট সব সময় আমাদের সাথে থাকে। না চাইলেও ছোট্ট পকেটে আমরা পুরো দুনিয়া নিয়ে ঘুরি। মানুষের সাথে মেশা, কথা বলা—খারাপ কিছু না। কিন্তু অত্যধিক গালগল্পে ব্যস্ত থাকলে একসময় আল্লাহকে দেয়ার মতো সময় খুঁজে পাওয়া কষ্ট হয়। তাঁর সাথে আমাদের দূরত্ব সৃষ্টি হয়। জীবনের প্রধান উদ্দেশ্যই চলে যায় ফোকাসের বাইরে।

দুনিয়াটাকে একপাশে রেখে পরকালের চিন্তা নিজের ভেতর জাগ্রত করতে খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি সুন্নাহ রাসূল ﷺ আমাদের শিখিয়েছেন। সেটা হচ্ছে কবরস্থানে যাওয়া। প্রথমে এটা হারাম ছিল। কারণ, সাহাবিরা তখন কেবলই মূর্তিপূজা ছেড়ে ইসলামে প্রবেশ করেছেন। সে সময়ে কবরস্থানে গেলে তাদের দ্বারা শরীয়তবিরোধী কোনো কাজ হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা ছিল। কিন্তু একবার যখন ঈমান তাদের হৃদয়ে গেঁথে গিয়েছিল, তখন রাসূল ﷺ তাদের কবরস্থানে যাওয়ার অনুমতি দেন।

রাসূল ﷺ বলেন,

كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ، فَزُورُوهَا

"আমি তোমাদের প্রথমে কবরস্থানে যেতে নিষেধ করেছিলাম। কিন্তু এখন তোমরা যেতে পারো।"[২০০]

কবরস্থানে যাওয়ার উপকারিতার কথা বলতে গিয়ে তিনি বলেন,

[২০০] ইবনে মাজাহ, হাদিস নং : ১৫৭১

فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الآخِرَةَ

"কারণ, এটি তোমাদের আখিরাতের কথা মনে করিয়ে দেবে।"[২০১]

সে সময়ে মুসলিমরা থাকতেন মরুভূমির নির্জন এলাকায়। তাদেরই যদি রাসূল ﷺ আখিরাতের কথা স্মরণ করতে কবরস্থানে যেতে বলতেন, তাহলে আমাদের জন্য এটি তো আরও অনেক বেশি দরকার। কবরস্থানে যাওয়ার ক্ষেত্রে কিছু বিধান রয়েছে। কিছু কাজ আছে যা কখনোই কবরস্থানে গিয়ে করা যাবে না। প্রথমে সেগুলো সম্পর্কে ভালোভাবে জেনে নিন। তারপর সময় করে মাঝে মাঝে কবরস্থানে যান। মৃতদের জন্য দু'আ করুন। বলুন:

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ، وَإِنَّا، إِنْ شَاءَ اللهُ لَلَاحِقُونَ، أَسْأَلُ اللهَ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةَ

"আপনাদের ওপর শান্তি বর্ষিত হোক হে মুমিন ও মুসলিম কবরবাসীরা। ইন শা আল্লাহ, আমরা আপনাদের সাথে যোগ দিচ্ছি। আল্লাহর কাছে আমাদের এবং আপনাদের জন্য নিরাপত্তা প্রার্থনা করি।"[২০২]

কবরস্থানে গিয়ে জীবনের উদ্দেশ্য নিয়ে গভীরভাবে ভাবুন। কেন আপনি এই পৃথিবীতে এসেছেন, কী করছেন এখানে আর কোথায় বা যাচ্ছেন! আজ এই কবরে যারা আছেন, তারাও কিন্তু একদিন আমাদের মতোই ছিলেন। তারা এই পৃথিবী দাপিয়ে বেড়িয়েছেন। ঠিক আমাদের মতো করেই তারা হেসেছেন, কেঁদেছেন, ভালোবেসেছেন। আমাদের মতোই তাদের বন্ধু ছিল। ছিল স্ত্রী, সন্তান, বন্ধু-বান্ধব। তারপর একদিন তারা পৃথিবীর বুক থেকে হারিয়ে গেছেন।

আমাদের ভাগ্যেও ঘটবে একই পরিণতি। যে পৃথিবীর পেছনে আমরা সারাটা জীবন ছুটছি, সেই পৃথিবী থেকেই একদিন সবাইকে রিক্তহস্তে ফিরতে হবে।

---

[২০১] তিরমিযী, হাদিস নং : ১০৫৪
[২০২] সহীহ মুসলিম, হাদিস নং : ৯৭৫

ফিতনা থেকে দূরে থাকুন, ভালো থাকুন

আমাদের ইতিহাসবিদরা সাবাছ ইবনে রিবয়ি নামে অদ্ভুত এক লোকের কথা উল্লেখ করেছেন। তার জীবনের দিকে তাকালে যে কেউ চমকে যাবে :

❋ সে প্রথমে সাজাহ্ নামের এক ভণ্ড মহিলা নবির ওপর ঈমান আনে। ওই মহিলার জন্য সাবাছ আজান দিত। পরে সেখান থেকে সে তওবা করে।

❋ তারপর ন্যায়পরায়ণ খলিফা উসমান ﵁ এর বিরুদ্ধে সে বিদ্রোহ করে আর তাকে হত্যা করায় অংশ নেয়। পরে সে তওবা করে।

❋ এরপর আমিরুল মুমিনীন আলী ﵁-এর বিরুদ্ধে সে খারেজিদের পক্ষে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে। তবে দ্রুত সে তওবা করে আলী ﵁-এর শিবিরে চলে আসে।

❋ এখানেই শেষ না। এরপর সে এমন সৈন্যদের দলে যোগ দেয়, যারা হুসাইন ﵁-কে হত্যা করেছে। কিন্তু হঠাৎ করে সাবাছ নিজের অবস্থান পরিবর্তন করে ফেলে। যারা হুসাইন ﵁-এর হত্যার বিচারের দাবি জানাচ্ছিল, তাদের দলে সে যোগ দেয়।

❋ গল্প আরও আছে। এরপর সাবাছ মুখতার ইবনে উবাইদুল্লাহর অনুসারী হয়ে যায়। পরে সে তওবা করে। আর যারা মুখতারের বিপক্ষে যুদ্ধ

করছে তাদের দলে যোগ দেয়।[২০৩]

➥ সাবাছের গল্প থেকে আমরা কী শিক্ষা পাই?

আমরা বুঝতে পারি, কেউ নিজেকে যদি বারবার ফিতনার কাছে নিয়ে যায়, তবে প্রতিবারই সে বড় রকমের ভুল করে ফেলতে পারে। নিজের ঈমানকে ধ্বংস করে ফেলতে পারে।

শেষ সময়ে মানবজাতি যে ফিতনার সম্মুখীন হবে সেটির কথা বলতে গিয়ে রাসূল ﷺ বলেন,

مَنْ تَشَرَّفَ لَهَا تَسْتَشْرِفْهُ، فَمَنْ وَجَدَ مَلْجَأً أَوْ مَعَاذًا، فَلْيَعُذْ بِهِ

"যে ফিতনার দিকে তাকাবে, ফিতনা তাকে পেয়ে বসবে। তখন কেউ যদি কোনো আশ্রয়স্থল কিংবা নিরাপদ জায়গা পায়, তাহলে সে যেন সেখানে আত্মরক্ষা করে।"[২০৪]

এ কারণেই শুধু ব্যভিচার না, ব্যভিচারের ধারেকাছে যেতেও আল্লাহ তা'আলা আমাদের নিষেধ করেছেন :

وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

"আর তোমরা ব্যভিচারের কাছেও যেয়ো না। নিশ্চয়ই তা অশ্লীল কাজ ও বাজে পথ।"[২০৫]

তবে আমাদের কুযুক্তির তো শেষ নেই। কেউ বলতেই পারে :

- "আরে! শুধু কৌতূহল থেকে দেখেছি। তেমন কিছু না।"
- "আমি তো শুধু সবার মতামতটা জানতে চেয়েছি।"
- "এসব না দেখলে, না জানলে সতর্ক হব কীভাবে?"
- "আমার নিজের ওপর বিশ্বাস আছে। এসবে আমার সমস্যা হয়

[২০৩] আল ইসাবা ফি তাময়ীযিস সাহাবা : ৩/৩০২-৩০৩
[২০৪] সহীহ বুখারি, হাদিস নং : ৭০৮২
[২০৫] সূরা ইসরা, ১৭ : ৩২

না। নিজেকে কন্ট্রোল করতে পারি।”

আর এরপর কিছু বুঝতে পারার আগেই ফিতনা তাকে চারদিক থেকে ঘিরে ধরে। সেখান থেকে আর বের হতে দেয় না। সে ডুবে যায় গুনাহের সাগরে।

আর এখন তো ফিতনায় পা পিছলে যাওয়া যেকোনো সময়ের চেয়ে অনেক সহজ। আমরা চাইলেই এখন যেকোনো জায়গায় চলে যেতে পারি। সোশ্যাল প্ল্যাটফর্মে যা ইচ্ছা বলতে পারি। দেখতে পারি। তবে যারা নিজের ঈমান সম্পর্কে সচেতন, নিজের আখিরাত সম্পর্কে সচেতন, তারা রাসূল ﷺ-এর নসীহার গুরুত্ব বোঝে। তারা ফিতনা থেকে গা বাঁচিয়ে চলে। সেটা হতে পারে :

❋ কোনো ফিতনাযুক্ত অনলাইন ওয়েবসাইট ভিজিট করা।

❋ কোনো মুসলিমের স্ক্যান্ডাল ঘাঁটতে যাওয়া।

❋ এমন কিছু দেখা যা নিজের ঈমানকে নাড়িয়ে দেয়।

এমন কিছু সামনে এলেই চোখ বন্ধ করে ফেলুন। দ্রুত সেখান থেকে বের হয়ে যান। ভবিষ্যতে যাতে এমন কিছু সামনে না আসতে পারে সে ব্যবস্থা করুন। ফিতনা থেকে দৌড়ে পালান। জেনে রাখবেন, এসব থেকে দূরে থাকলেই সফল হওয়া যায়। ভালো থাকা যায়।

রাসূল ﷺ বলেন,

إِنَّ السَّعِيدَ لَمَنْ جُنِّبَ الْفِتَنَ

“যাকে ফিতনা থেকে দূরে রাখা হলো, সে-ই তো সৌভাগ্যবান হলো।”[২০৬]

নিজের ঈমানকে পরীক্ষায় ফেলবেন না। এ পরীক্ষায় ফেল করলে কিন্তু মহাবিপদ।

[২০৬] আবু দাউদ, হাদিস নং : ৪২৬৩

কখনো সমুদ্রের ফেনা দেখেছেন?

- চেহারার উজ্জ্বলতা বাড়িয়ে দেয়।
- অন্তরে নূর বৃদ্ধি করে।
- রিযিক প্রশস্ত করে দেয়।
- শরীরে শক্তি বাড়িয়ে দেয়।
- মানুষের অন্তরে ভালোবাসা সৃষ্টি করে।

সাহাবি আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস ﵄-এর মতে এগুলো হচ্ছে আমাদের ভালো কাজের ফলাফল।[২০৭] কিন্তু তিনি এখানেই থেমে যাননি। এরপর তিনি গুনাহের কুপ্রভাব নিয়ে কথা বলেছেন :

- চেহারা কুৎসিত করে ফেলে।[২০৮]
- হৃদয়ে কালিমা লেপন করে।[২০৯]

---

[২০৭] রাওদাতুল মুহিব্বিন : ১/৪৪১

[২০৮] ইবনুল কায়্যিম ﵀ বলেন, "রাত গভীর হলে যেভাবে কোনো ব্যক্তি আঁধারকে অনুভব করে সেভাবে একজন পাপী তার অন্তরে খুঁজে পাবে অন্ধকারকে। বাহ্যিক অন্ধকারে যেমন সে চোখ দিয়ে ঠিকমতো দেখতে পায় না, ঠিক একইভাবে মনের এই অন্ধকারও প্রভাব ফেলে তার অন্তরে। কারণ, (আল্লাহ তা'আলার প্রতি) আনুগত্য হচ্ছে নূর, আর অবাধ্যতা হচ্ছে আঁধার। অন্ধকার যত বাড়বে, তার সংশয়ও তত বাড়বে। একসময়ে সে বিদআতে লিপ্ত হবে। পথভ্রষ্ট হবে। সে হচ্ছে এক অন্ধের মতো। যে ঘুটঘুটে অন্ধকারে রাতের বেলা বের হয়েছে। এভাবে নিজের অজান্তেই সে নিজের ধ্বংস ডেকে এনেছে। এই অন্ধকার একসময় অনেক বেড়ে গিয়ে তার চোখকে ঢেকে দেয়। মুখে আবরণ ফেলে দেয়। একসময় সবাই তার চেহারায় কদর্যতা দেখতে পায়।" (আল-জাওয়াবুল কাফি : ১/৫৬)

[২০৯] ইমাম মালিক ﵀ ইমাম শাফি'ই ﵀ এর অসাধারণ মেধা আর প্রতিভা দেখে মুগ্ধ হয়ে বলেছিলেন, "আমার মনে হয় আল্লাহ তা'আলা তোমার অন্তরে এই নূর ঢেলে দিয়েছেন। একে গুনাহের অন্ধকার দিয়ে দূর করে দিয়ো না।" (আল-জাওয়াবুল কাফি : ১/৫২)

- রিযিক কমিয়ে দেয়।[২১০]
- দেহকে দুর্বল করে ফেলে।[২১১]
- লোকজনের মনে ঘৃণা সৃষ্টি করে।[২১২]

গুনাহ এভাবেই সবদিক দিয়ে আমাদের বিপর্যস্ত করে ফেলে। গুনাহের সময়টুকু হয়তো খুব উপভোগ করা যায়। কিন্তু এরপরের অনুভূতিটা কেমন? লজ্জার, অনুশোচনার, অপমানের। হয়তো কেউ দেখেনি। দেখে ফেললে অপমান করত। 'ভণ্ড' বলে গালি দিত। কিন্তু অন্যের কাছে অপমানিত হওয়া যতটা লজ্জার তার চেয়ে তো অনেক বেশি লজ্জার নিজের কাছে প্রতিনিয়ত অপমানিত হওয়া। এ অপমান সব সময় নিজেকে ঘিরে ধরে। ঘুমানো যায় না। মানুষের সাথে কথা বলতে লজ্জা লাগে। আল্লাহর সামনে দাঁড়াতে লজ্জা লাগে।

এভাবে ডা. জেকিল আর মি. হাইডের জীবন নিয়ে বেঁচে থাকা সত্যিই অনেক কষ্টের। কিন্তু গুনাহ থেকে পুরোপুরি বেঁচে থাকা তো আর সম্ভব না। তাই রাসূল ﷺ আমাদের কিছু উপায় বলে দিয়েছেন। এগুলো অনুসরণ করলে আমাদের জানা-অজানা অনেক গুনাহই পরম দয়াময় ক্ষমা করে দেবেন। আমাদের মৃত অন্তরকে আবার জীবিত করবেন।

➡ এমন পাঁচটি উপায় হচ্ছে:

(১) খাবারের পর গুনাহ মাফ :

রাসূল ﷺ বলেছেন, "যদি কেউ খাবার খাওয়ার পর বলে,

الْحَمْدُ لِلَّـهِ الَّذِي أَطْعَمَنِي هَذَا الطَّعَامَ، وَرَزَقَنِيهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِنِّي وَلَا قُوَّةٍ

---

[২১০] রাসূল ﷺ বলেছেন, "মানুষ তার গুনাহের কারণে রিযিক থেকে বঞ্চিত হয়।" (ইবনে হিব্বান, হাদিস নং : ৮৭২)

[২১১] শুধু তা-ই না, গুনাহ মানুষের তওবা করার ক্ষমতাকেও কেড়ে নেয়। ইবনুল কায়্যিম রহ. বলেন, "গুনাহ মানুষের ইচ্ছাশক্তিকে দুর্বল করে ফেলে। গুনাহ করার আকাঙ্ক্ষা বাড়িয়ে দেয়। কমিয়ে দেয় তওবা করার ইচ্ছাকে। একসময় তার আর তওবা করার কোনো ইচ্ছাই থাকে না। (আর তওবা করলেও দায়সারাগোছের তওবা করে) সে ক্ষমা চায়, অনুশোচনা প্রকাশ করে। কিন্তু সেটা মুখের ঠোঁট নাড়ানো ছাড়া আর কিছুই না। তার তওবা তো মিথ্যুকদের তওবার মতো। (যে মুখে তওবা করলেও) ভেতরে ভেতরে ঠিকই গুনাহ করার ধান্দায় থাকে। তার ইচ্ছা থাকে সে গুনাহের ওপরই অটল থাকার। (আল-জাওয়াবুল কাফি : ১/৫৬)

[২১২] একজন সালাফ বলতেন, "কোনো গুনাহ করলে আমার বাহন এমনকি আমার স্ত্রীর মধ্যেও আমি এর প্রভাব দেখতে পেতাম।" (আল-জাওয়াবুল কাফি : ১/৫৪)

'সকল প্রশংসা তাঁর যিনি আমাকে এই খাবার খাইয়েছেন। আমার নিজের এ ব্যাপারে কোনো শক্তি বা ক্ষমতা ছিল না।'

তার পূর্বের সকল গুনাহ মাফ করে দেয়া হবে।"[২১৩]

২) কাপড় পরিধানের পর গুনাহ মাফ :

রাসূল ﷺ বলেছেন, "যদি কেউ জামা গায়ে দিয়ে বলে,

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي كَسَانِي هَذَا الثَّوْبَ وَرَزَقَنِيهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِنِّي، وَلَا قُوَّةٍ

'সকল প্রশংসা তাঁর যিনি আমাকে এই জামা পরিয়েছেন আর এটিকে আমার জন্য বরকতময় করেছেন। আমার নিজের এ ব্যাপারে কোনো শক্তি বা ক্ষমতা ছিল না।'

তার আগের সব গুনাহ মাফ করে দেয়া হবে।"[২১৪]

৩) সালাত শেষ করে গুনাহ মাফ :

রাসূল ﷺ বলেছেন, "যে ব্যক্তি প্রত্যেক সালাতের পর ৩৩ বার করে বলবে,

سُبْحَانَ اللهِ

'আল্লাহ্ কতই-না পবিত্র-মহান।'

اَلْحَمْدُ للهِ

'সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য।'

اَللهُ أَكْبَرُ

[২১৩] আবু দাউদ, হাদিস নং : ৪০২৩
[২১৪] আবু দাউদ, হাদিস নং : ৪০২৩

‘আল্লাহ্ সবচেয়ে বড়।’

এভাবে মোট ৯৯ বার। এরপর ১০০ বার করার জন্য নিচের দু‘আ বলবে,

لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَ هُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ

‘একমাত্র আল্লাহ ছাড়া প্রকৃত কোনো ইলাহ নেই। তাঁর কোনো শরীক নেই। রাজত্ব তাঁরই। তাঁর জন্যই সকল প্রশংসা। তিনি সবকিছুর ওপর ক্ষমতাবান।’

তার গুনাহসমূহ মাফ করে দেয়া হবে যদিও তা সমুদ্রের ফেনার পরিমাণ হয়।”[২১৫]

(৪) অবসর সময়ে গুনাহ মাফ :

রাসূল ﷺ বলেছেন, “পৃথিবীতে এমন কেউ নেই যে বলে,

لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّـهُ وَاللَّـهُ أَكْبَرُ وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللَّـهِ

‘আল্লাহ ছাড়া কোনো সত্য ইলাহ নেই। তিনি সবার চাইতে বড়। তাঁর সাহায্য ছাড়া কোনো উপায় ও শক্তি নেই।’

আর তার গুনাহসমূহ মাফ করা হয় না, এমনকি তা সমুদ্রের ফেনার পরিমাণ হলেও।”[২১৬]

রাসূল ﷺ আরও বলেছেন, “যে প্রতিদিন ১০০ বার বলবে,

سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ

‘প্রশংসাসহ আমি আল্লাহর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করছি।’

তার গুনাহসমূহ মাফ করে দেয়া হবে যদিও তা সমুদ্রের ফেনার পরিমাণ হয়।[২১৭]

---

[২১৫] সহীহ মুসলিম, হাদিস নং : ৫৯৭
[২১৬] তিরমিযী, হাদিস নং : ৩৪৬০
[২১৭] সহীহ মুসলিম, হাদিস নং : ২৬৯১

৫) ঘুমোতে যাবার আগে গুনাহ মাফ :

রাসূল ﷺ বলেছেন, "যদি কেউ ঘুমোতে যাবার আগে বলে,

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّـهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّـهِ، سُبْحَانَ اللَّـهِ وَالْحَمْدُ لِلَّـهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّـهُ وَاللَّـهُ أَكْبَرُ

'আল্লাহ ছাড়া কোনো সত্য ইলাহ নেই। তাঁর কোনো শরীক নেই। রাজত্ব তাঁরই। তাঁর জন্যই সকল প্রশংসা। তিনি সকল বিষয়ের ওপর ক্ষমতাবান। আল্লাহর সাহায্য ছাড়া কোনো উপায় ও শক্তি নেই। আল্লাহ কতই-না পবিত্র-মহান। তাঁর জন্যই সকল প্রশংসা। আল্লাহ ছাড়া কোনো প্রকৃত ইলাহ নেই। আর তিনি সবার চাইতে বড়।'

তার গুনাহসমূহ মাফ করে দেয়া হবে যদিও তা সমুদ্রের ফেনার পরিমাণ হয়।"[২১৮]

আপনার আরবি পড়ায় এখনো সমস্যা থেকে থাকলে যে আরবি ভালো পারে তার কাছ থেকে দু'আগুলো শিখে নিন। সম্ভব হলে রেকর্ড করে নিন। তারপর প্রতিদিন এই দু'আগুলো পড়ুন।

➥ তবে এই ব্যাপারগুলোও ভুলে গেলে চলবে না :

❋ আল্লাহ তা'আলা নিজেই আমাদেরকে আমাদের গুনাহসমূফ মাফ করিয়ে নেয়ার এই অফার দিয়েছেন। তাই মনে কোনো নিরাশা রাখা যাবে না।

❋ এই দু'আগুলো কবুল হলে আপনার কাবীরা গুনাহও যে মুছে যাবে তা কিন্তু না। কাবীরা গুনাহের জন্য আলাদাভাবে আন্তরিক তওবা করতে হবে।

❋ এই দু'আ পাঠ করার ফলে তাদের গুনাহ মাফ হবে, যারা কোনো

[২১৮] ইবনে হিব্বান, হাদিস নং : ৫৫২৮

গুনাহের ওপর অটল থাকে না। কিংবা ভবিষ্যতে আবার ইচ্ছা করে কোনো গুনাহ করার ইচ্ছা মনের মধ্যে পুষে রাখে না।

❋ সত্যিকারের তওবা আমাদের জীবনের সব গুনাহ মুছে ফেলে।

নিজের ইচ্ছামতো গুনাহ করব আর তারপর যখন মন চাইবে দু'আগুলো পড়ে গুনাহ মাফ করিয়ে নেব, এমন চিন্তা কখনোই রাখা যাবে না। যারা এমনটা ভাবে তাদের সাবধান করে ইবনে বাত্তাল ﵀ বলেন,

"কেউ যেন এটা না মনে করে যে, হারাম কামনায় লিপ্ত থেকে আর আল্লাহর দীন ও তাঁর বেঁধে দেয়া সীমা প্রতিনিয়ত লঙ্ঘন করে সারাদিন শুধু এই দু'আগুলো পড়েই পবিত্র ও পাপমুক্ত হওয়া যাবে।

আল্লাহর ভয় ও উত্তম কাজ ছাড়া শুধু মুখে মুখে এই কথাগুলো বলার কোনো মানেই হয় না।"[২১৯]

মহান আল্লাহ তা'আলা তাঁর অসীম দয়া দ্বারা আমাদের গুনাহসমূহ মাফের অনেকগুলো সুযোগ তৈরি করে দিয়েছেন। নিজের প্রবৃত্তির উপাসনা করে যে এই সুযোগগুলো নষ্ট করে, তার চেয়ে আহাম্মক আর কে হতে পারে?

---

[২১৯] শরহুল যরকানি আলা মুয়াত্তা : ২/৩৩

খালি পায়ে হাঁটা

সব কাজের পেছনেই আমরা অজুহাত প্রস্তুত রাখি। সে অজুহাত ঠিক হোক আর যত খোঁড়াই হোক। কীভাবে যেন আমরা ঠিকই আমাদের কাজকে সবার সামনে ঠিক প্রমাণ করতে একটা না একটা যুক্তি পেয়ে যাই।

মাত্রাতিরিক্ত দুনিয়ার হালাল বিষয়ে ব্যস্ত থাকাটাকেই উদাহারণ হিসেবে ধরা যাক। জীবনের বেশির ভাগ সময় দুনিয়া নিয়ে ব্যস্ত থাকায়, আমরা আল্লাহ তা'আলাকে ভুলে যাই। ভুলে যাই একদিন আমাদেরকে আমাদের রবের সামনে দাঁড়াতে হবে। পৃথিবীতে কীভাবে নিজের সময়গুলো কাটিয়েছি তার হিসাব দিতে হবে। এভাবে একসময় আমরা আল্লাহ তা'আলার সাথে সাক্ষাৎ করার বিষয়টিই ঘৃণা করা শুরু করি। যখন কেউ আমাদের আল্লাহ তা'আলাকে বেশি বেশি ভয় করতে বলে, তখন জবাব দিই, "আরে! আমি কি হারাম কিছু করছি?" হয়তো হারাম কিছু করছি না। তবে ব্যস্ত শিডিউল থেকে কিছুটা সময় বের করে কি আমাদের চারপাশে তাকানোর সময় হবে?

➡ মুসলিম উম্মাহ আজ জায়গায় জায়গায় মার খাচ্ছে :

➤ আমাদের সন্তানেরা খাদ্যাভাবে ধুঁকে ধুঁকে মারা যাচ্ছে।[২২০]

---

[২২০] খাদ্যাভাবে ইয়ামেনের প্রায় ৪ লক্ষ শিশু আজ মৃত্যুর সম্মুখীন। প্রায় ৯ লক্ষ শিশু ডায়েরিয়া ও কলেরাতে আক্রান্ত। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, সাম্প্রতিক সময়ে এটাই হবে পৃথিবীতে ঘটে যাওয়া সবচেয়ে বড় দুর্ভিক্ষ। এমনকি ইয়ামেনের অবস্থা ২০১১ সালে সোমালিয়াতে ঘটে যাওয়া দুর্ভিক্ষের চেয়েও (যেখানে প্রায় আড়াই লক্ষ মানুষ মারা গিয়েছিল) মারাত্মক হতে পারে।

- https://www.unicef.org/infobycountry/yemen_85651.html

➤ আমাদের ভাইদের হত্যা করা হচ্ছে।[২২১]

➤ বোনদের ধর্ষণ করা হচ্ছে।[২২২]

➤ অসহায় মুসলিমদের দেশ থেকে তাড়িয়ে দেয়া হচ্ছে।[২২৩]

এটা স্বাভাবিক যে, আমরা আমাদের ভাই-বোনদের কষ্টে ব্যথিত হব।[২২৪] তাদের জন্য সাধ্যমতো যা করা যায় তা-ই করব। আমাদের ভাইদের অনাহারে কষ্টে রেখে দুনিয়ার ভোগ-বিলাসে জীবনটা পার করে দেবো না। কিন্তু বাস্তবে দেখা যায়, বহু মুসলিমই তার ভাইদের কষ্টের দিকে ভ্রুক্ষেপ করে না। বেছে নেয় এক আরামের জীবনকে। তাদের চিন্তা-ভাবনা কেবল এই দুনিয়াকে ঘিরেই আবর্তিত হয়।

এই দীনের জন্য সর্বোচ্চ ত্যাগ তখনই সম্ভব যদি আমরা এই দুনিয়ার নগণ্যতা অনুভব করতে পারি। আর সেটা অনুভব করার একটি উপায় রাসূল ﷺ আমাদের

[২২১] রিপোর্ট অনুসারে সিরিয়ার যুদ্ধে প্রায় চার লক্ষ মানুষ প্রাণ হারিয়েছে। পাঁচ লক্ষ মানুষ প্রাণের ভয়ে দেশ ত্যাগ করেছে। ছয় লক্ষ মানুষকে হতে হয়েছে বাস্তুহারা।

■ http://edition.cnn.com/2013/08/27/world/meast/syria-civil-war-fast-facts/index.html

[২২২] পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশি মিলিটারি আর্মি দিয়ে ঘেরা জায়গার নাম কিন্তু ইরাক অথবা সিরিয়া নয়। জায়গাটির নাম কাশ্মীর। এখানে প্রায় ৬ লক্ষ মিলিটারি আর্মি রয়েছে। কাশ্মীরের সাধারণ মানুষকে সব সময় ভীত-সন্ত্রস্ত রাখার জন্য এরা ধর্ষণকে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করে। শুধু ২০০৬-১৩ সালেই প্রায় ১৩৩৬ জন নারীকে ধর্ষণ করার রিপোর্ট এসেছে। এদের মধ্যে অনেকের বয়সই ১৮ এর নিচে। তবে প্রকৃত সংখ্যাটা আরও অনেক বেশি। ইন্ডিয়ান গভর্নমেন্ট সেখানে যথাযথ তদন্ত করার সুযোগ দেয় না। আবার যারা রিপোর্ট করে, তাদের পরিবারকে প্রশাসন থেকে নানা প্রকার হুমকি দেয়া হয়। তাই ভয়ে অনেকেই রিপোর্ট করে না। যার কারণে প্রকৃত সংখ্যাটা বের করা সম্ভব হয়নি। ২০০৫ সালে *'Médecins Sans Frontières'*-এর একটি সার্ভেতে যাদের সাক্ষাৎকার নেয়া হয় তাদের মধ্যে ১১.২% জানায় তারা শারীরিকভাবে লাঞ্ছিত হয়েছে। প্রতি সাতজনের একজন জানায় তারা কাউকে না-কাউকে ধর্ষিত হতে দেখেছে।
অধিকৃত কাশ্মীরে ইন্ডিয়া তাদের সবচেয়ে ন্যাক্কারজনক ইতিহাসের সৃষ্টি করে ১৯৯১ সালের ২৩ শে ফেব্রুয়ারি। সেদিন কাশ্মীরের দুইটি গ্রামে সার্চ অপারেশনের নামে বহু নারীকে ধর্ষণ করা হয়। সে নারীদের আর কোথাও বিয়ে হয়নি। এমনকি এই দুই গ্রামের মেয়েরা এরপর আর কখনোই অন্য এলাকা থেকে বিয়ের প্রস্তাব পায়নি।

■ http://www.huffingtonpost.co.uk/rita-pal/rape-in-kashmir_b_3372513.html

■ http://www.milligazette.com/news/7188-1336-rape-cases-in-kashmir-in-seven-years-conviction-rate-woefully-low

[২২৩] এ জুলুমের উদাহারণ আমাদের প্রতিবেশী রাষ্ট্রেই রয়েছে। UN-এর একটি রিপোর্টে যাদের বলা হয়েছে, *"The most oppressed people on Earth"*।
২০১৭ সালের পূর্বেই প্রায় ১,৪০,০০০ রোহিঙ্গা মুসলিমদের জোর করে তাদের বাড়ি থেকে উচ্ছেদ করা হয়েছে। তাদের বাড়িঘর জ্বালিয়ে দেয়া হয়েছে। ১ লক্ষ রোহিঙ্গা নৌকার মাধ্যমে পার্শ্ববর্তী দেশ বাংলাদেশ, থাইল্যান্ড আর মালয়েশিয়াতে পালিয়েছে। এই মুহূর্তেও পালানোর চেষ্টা করছে বহু মানুষ।
আর ভেতরে যারা আটকে পড়ে আছে আছে তাদের অবস্থা আরও নাজুক। তাদের নাগরিকত্ব থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে, কেড়ে নেয়া হয়েছে সকল মৌলিক অধিকার। তারা অনুমতি ছাড়া বিয়ে করতে পারে না, কোথাও কাজ করতে পারে না এমনকি ভ্রমণও করতে পারে না। শুধু ২০১৭ সালেই ৮ লক্ষ রোহিঙ্গাদের আশ্রয় দিতে বাংলাদেশে একটি শরণার্থী শিবির বানাতে হয়েছিল।

■ http://endgenocide.org/conflict-areas/burma/

■ http://time.com/4089276/burma-rohingya-genocide-report-documentary/

■ http://edition.cnn.com/2017/10/06/asia/bangladesh-rohingya-new-camp/index.html

[২২৪] রাসূল ﷺ বলেছেন, "তুমি মুমিনদের পারস্পরিক দয়া-ভালোবাসা ও সহানুভূতি প্রদর্শনে একটি দেহের ন্যায় দেখতে পাবে। যখন দেহের একটি অঙ্গ রোগে আক্রান্ত হয়, তখন শরীরের পুরো দেহ রাত জাগে আর জ্বরে ভোগে।" (সহীহ বুখারি, হাদিস নং : ৬০১১)

শিখিয়ে দিয়েছেন। একজন সাহাবি বলেছেন,

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُنَا أَنْ نَحْتَفِيَ أَحْيَانًا

"রাসূল ﷺ আমাদের খালি পায়ে হাঁটতে নির্দেশ দিতেন।"[২২৫]

খালি পায়ে হাঁটলে নিজের ক্ষুদ্রতা উপলব্ধি হয়। নিজের অসহায়ত্ব বোঝা যায়। এ দুনিয়ার নগণ্যতা অনুভব করা যায়। এ কারণেই ইমাম আল মানাওই রহিমাহুল্লাহ বলেছেন,

> "যদি কেউ নিশ্চিত থাকে যে তার পায়ে কোনো ময়লা লাগবে না কিংবা কোনো ক্ষতি হবে না, তাহলে নিজের মনটাকে নরম করার জন্য মাঝে মাঝে খালি পায়ে হাঁটা উচিত। এ জন্যই বর্ণিত আছে, রাসূল ﷺ কখনো জুতোসহ, আবার কখনো বা জুতো ছাড়া হাঁটতেন। সাহাবারাও একই কাজ করতেন।"[২২৬]

আমরা টিভিতে অনেককেই খালি পায়ে হাঁটতে দেখি। উপন্যাসের বই পড়ে সারা রাত খালি পায়ে হাঁটার পাগলামিও অনেকে করে। অথচ আমরা যদি রাসূল ﷺ-এর ভালোবেসে খালি পায়ে হাঁটাতাম, তবে কিছু সওয়াব আমাদের আমলনামায় যোগ হতো। অন্তরে তাকওয়া বেড়ে যেত। হারিয়ে যাওয়া এই সুন্নাহটি আমাদের চোখে আঙুল দিয়ে নিজের অসহায়ত্ব বুঝিয়ে দেয়। এই বোধ আমাদের মাঝে এনে দেয়—আমরা হচ্ছি মিসকিন। আমাদের জীবনে যা কিছু আছে সবই তাঁর দেয়া। মহাবিশ্বের স্রষ্টার সামনে এই দুনিয়া কিছুই না।

আমরা কিসের পেছনে ছুটছি?

---

[২২৫] আবু দাউদ, হাদিস নং : ৪১৬০
[২২৬] ফয়দুল ক্বদীর : ১/৩১৭

যে আয় মৃত্যুর পরেও থেকে যায়

এক ব্যক্তির কথা ভাবুন। বাসার সবাই তার আয়ের ওপর নির্ভরশীল। তার টাকা দিয়ে ছেলেমেয়েদের টিউশনির টাকা দিতে হয়, বাড়িভাড়া দেয়া হয়। সবকিছু জোগাড় করতে প্রতিমাসেই তাকে বেশ হিমশিম খেতে হয়। তার মাথার মধ্যে রয়েছে পাহাড়সম ঋণের বোঝা। এর ওপর আবার একদিন অফিসে যাওয়ার পর তার মাথায় বিনা মেঘে বজ্রপাত হলো। ম্যানেজার তাকে রুমে ডেকে নিয়ে বললেন, “আমরা দুঃখিত! সামনের মাসে আপনাকে ছাঁটাই করা হবে।”

এই লোকটির আর কোনো আয় নেই। কোনো সঞ্চয়ও নেই। আমি আপনাদের জিজ্ঞেস করি :

❋ এই লোক কি সে রাতে ভালোভাবে ঘুমাতে পারবে?

❋ সে কি পারবে শুয়ে-বসে সময় নষ্ট করতে?

❋ সে কি পাগলের মতো এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় দৌড়াবে না সামনের মাস আসার আগেই আয়ের একটি ব্যবস্থা করতে?

শুধু সে না আমরা সবাই-ই একই আচরণ করব। এমনকি কেউ কেউ এ সময় এতটাই নিরাশ হয়ে পড়ে যে, আত্মহত্যা পর্যন্ত করে ফেলে। জাপানে এটি সবচেয়ে বেশি দেখা যায়। যারা আত্মহত্যা করে ইনস্যুরেন্স কোম্পানিগুলো তাদের পরিবারকে বেশ কিছু টাকা দেয়। তাই যখন কোনো উপায়ই আর সামনে খোলা থাকে না, তারা

আত্মহত্যার পথই বেছে নেয়।[২২৭]

এবার রাসূল ﷺ-এর এই হাদিসটি নিয়ে কিছুক্ষণ ভাবা যাক,

إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلا مِنْ ثَلاثَةٍ : إِلا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

"যখন কেউ মারা যায়, তিনটি ক্ষেত্র ছাড়া তার সকল ভালো আমল বন্ধ হয়ে যায়। (১) তার সেই সদকা যা মানুষের উপকার করতে প্রবহমান থাকে। (২) তার সেই ইলম যা দ্বারা উপকৃত হওয়া যায়। (৩) আর ভালো সন্তান যে তার জন্য দু'আ করে।"[২২৮]

দুনিয়ার জীবনে যেভাবে কখনো কখনো আমাদের সকল আয়ের পথ বন্ধ হয়ে যায়, তেমনি এমন একটা দিন আসবে যেদিন শুধু দুনিয়াতে না আখিরাতেও সওয়াব লাভের পথ বন্ধ হয়ে যাবে। দুনিয়াতে এক জায়গায় আয় বন্ধ হয়ে গেলে আমরা অন্য জায়গায় খুঁজতে পারি, কিন্তু মৃত্যু এসে গেলে আমাদের সামনে আর কোনো পথই খোলা থাকবে না। আমরা জানি না কখন আমাদের অফিসের ম্যানেজার এসে আমাদের চাকরি থেকে ছাঁটাই করবে কিংবা অবসরের আগে আদৌ করবে কি না তাও আমাদের অজানা। তবে এটা তো জানি যে, মৃত্যু-পরোয়ানা আমাদের সবার কপালে লেখা হয়ে গেছে। আমরা সবাই জানি, একদিন আমাদের মরতে হবে। যাদের ঘিরে আজ দুনিয়াতে আমাদের ছোটাছুটি, যাদের মুখে হাসি ফোটাতে আমরা নাওয়া-খাওয়া ভুলে গিয়েছি, তারাই একদিন আমাদের ভুলে যাবে। অথচ অফিসে ছাঁটাইয়ের নোটিশ পেলে আমরা যতটা অস্থির হই, মৃত্যু কিন্তু সে তুলনায় আমাদের একটুও ভাবায় না।

আমাদের অনেকের জন্যেই মরে যাওয়া মানেই সকল ভালো আমল বন্ধ হয়ে যাওয়া। তবে সবার জন্য না। তারা কবরে থেকেও দুনিয়াতে করা তাদের ভালো আমলের সওয়াব পেতে থাকে। আর কিয়ামত পর্যন্ত সে সওয়াব বৃদ্ধি পেতে থাকে। তাই নিজেকে জিজ্ঞেস করুন, আমি কীভাবে তাদের মতো হতে পারব? এ জন্য আমার কী কী করতে হবে? এখন কী কী করা উচিত?

---

[২২৭] Why does Japan have such a high suicide rate? http://www.bbc.com/news/world-33362387

[২২৮] সহীহ মুসলিম, হাদিস নং : ১৬৩১

যদি অনেক ভেবেও কোনো কূল-কিনারা না পান, তবে রাসূল ﷺ-এর এই হাদিসে আপনার জন্য কয়েকটি গাইডলাইন রয়েছে :

سبعٌ يَجري للعبد أجرُهنَّ وهو في قبره بعد موته: مَن علَّم علمًا، أو أجرى نهرًا، أو حفر بئرًا، أو غرس نخلاً، أو بنى مسجدًا، أو ورَّث مصحفًا، أو ترك ولدًا يستغفر له بعد موته

"মৃত্যুর পর কবরে থেকেও মানুষ সাতটি ক্ষেত্রে সওয়াব লাভ করে। (১) যে মানুষকে ইলম শিক্ষা দিয়েছে। (২) নদী তৈরি করে দিয়েছে। (৩) কূপ খনন করেছে। (৪) গাছ লাগিয়েছে। (৫) মসজিদ তৈরি করেছে। (৬) কাউকে কুরআন দিয়েছে। (৭) একটি ভালো সন্তান রেখে গিয়েছে যে মৃত্যুর পর তার জন্য দু'আ করেছে।"[২২৯]

আজ আমরা অনেক ভাষায় কথা বলি। কিন্তু কাল কিয়ামতের দিনে যখন আমাদের সামনে আমলনামা আনা হবে, জান্নাত-জাহান্নামকে দেখানো হবে, আল্লাহ তা'আলা আমাদের বিচার করবেন, সেদিন শুধু একটি ভাষাই থাকবে—"আমাদের আমলের ভাষা।"

তাই আজ থেকেই রাসূল ﷺ-এর এই উপদেশটি ভালোভাবে মাথায় ঢোকান। ভালোভাবে ভাবুন, আপনার পক্ষে এমন কী করা সম্ভব যার সুফল আপনি মৃত্যুর পরেও ভোগ করতে পারবেন। একা না পারলে বন্ধুদের নিয়ে একটি গ্রুপ বানিয়ে ফেলুন। কয়েকটি আইডিয়া দিচ্ছি :

❊ বিভিন্ন ইসলামিক লেকচারের প্রতিলিপি তৈরি করে ফেলুন। এরপর তা সোশাল মিডিয়াতে ছড়িয়ে দিন।

❊ কোনো ইসলামিক বই প্রকাশ করতে সহযোগিতা করুন।

❊ যদি আপনি লিখতে ভালোবাসেন, তাহলে নসীহামূলক একটি বই লিখে ফেলুন। তবে সাধারণ মানুষের উচিত, কোনো বিজ্ঞ আলেমকে দিয়ে বইটিতে কোনো ভুল আছে কি না তা যাচাই করিয়ে নেয়া।

❊ কোনো তলিবুল ইলমকে অর্থ দিয়ে সহায়তা করুন।

❊ ছেলেমেয়েদের এমনভাবে মানুষ করুন যেন তারা বড় হয়ে

[২২৯] শুয়াবুল ঈমান, হাদিস নং : ৩১৭৫

খালিদ বিন ওয়ালিদ ﷺ, সালাহউদ্দিন আইয়ুবী ﷺ-এর মতো হিরো হয়। তারা এই উম্মাহর জন্য লড়ে। আপনার জন্য তখন শুধু তারা না, পুরো উম্মাহই দু'আ করবে।

❋ একাডেমিক ব্যাকগ্রাউন্ড ভালো থাকলে কোনো ইসলামিক স্কুলে সময় দিন। সম্ভব না হলে অর্থ দিয়ে সহায়তা করুন।

❋ সবাই মিলে একটি এতিমখানা তৈরি করার চেষ্টা করুন। প্রয়োজনে এলাকার বিত্তবানদের সাহায্য নিন।

❋ একটি ইয়্যুথ ক্লাব বানিয়ে ফেলুন। তবে সেখানে ভালো পরিবেশ রাখবেন। খেয়াল রাখবেন, তরুণরা যেন সেখানে এসে কিছু শিখতে পারে।

❋ একটি ইসলামিক ওয়েবসাইট তৈরি করতে পারেন, যেখানে মানুষ ইসলাম সম্পর্কে বিশুদ্ধ জ্ঞান পাবে।

❋ সবাইকে সাথে নিয়ে কোনো আলেমের সংস্পর্শে থাকতে পারেন। কে জানে! একটি লেকচারই হয়তো বহু মানুষের জীবন বদলে দিতে পারে।

❋ মানুষের মধ্যে বিবাদ মেটানোর জন্য 'হিলফুল ফুযুল'-এর মতো একটি সংস্থা খুলে ফেলতে পারেন।

❋ বিভিন্ন ইসলামিক বই সবাইকে গিফট করতে পারেন।

❋ ডাক্তারদের নিয়ে সপ্তাহের একটি নির্দিষ্ট দিন মানুষকে মসজিদে বিনামূল্যে চিকিৎসাসেবা দেয়ার ব্যবস্থা করতে পারেন।

➥ ইমাম ইবনুল কায়্যিম ﷺ বলেছেন,

"কতই-না মর্যাদার সে স্থান, কতই-না সম্মানের অধিকারী সে! যখন কেউ নিজেকে দুনিয়ার কাজে ব্যস্ত রাখছে কিংবা হয়তো (দুনিয়াতে না) কবরে তার দেহ পচে যাচ্ছে, কিন্তু তবুও তার আমলনামায় ভালো ভালো কাজ যুক্ত হচ্ছে। সে সওয়াব এমন এমন জায়গা থেকে আসছে, যেটার কথা সে কখনো চিন্তাও করেনি। আল্লাহর কসম! এটাই হচ্ছে প্রকৃত সম্মান। সবচেয়ে বড় অর্জন। আর এ সম্মান অর্জন করতেই সবার প্রতিযোগিতা করা উচিত।"[২৩০]

---

[২৩০] তারিকুল হিজরাতাইন : ১/৩৫৩

অসীয়ত করে যাওয়া

প্রায়ই আমরা অন্তরের কাঠিন্যের অভিযোগ করি। আল্লাহ তা‘আলার প্রতি আগের মতো আর ভয় কাজ করছে না বলে আফসোস করি। অন্তরের যেকোনো অসুখের জন্য সবচেয়ে কার্যকর ওষুধ হচ্ছে বেশি বেশি মৃত্যুকে স্মরণ করা। মৃত্যুর কথা স্মরণ হলে আমাদের মনে পড়ে যায়, একদিন আমাদেরকে আমাদের রবের সামনে দাঁড়াতে হবে। দুনিয়াতে আমাদের করা কাজের জন্য জবাবদিহি করতে হবে। জীবনে দুঃখ-কষ্ট এলেও তখন আমরা মেনে নিতে শিখি। ক্ষণস্থায়ী দুনিয়ার চেয়ে চিরস্থায়ী আখিরাতে বেশি মনোযোগ দেয়ার চেষ্টা করি।

দাক্কাক ﵀ বলেছেন,

مَن أكثر ذكر الموت أكرمه الله بثلاث : بتعجيل التوبة , وقناعة في القلب , ونشاط في العبادة , ومَن نسي الموت عاقبه الله بثلاث : بتسويف التوبة , وترك الرضا بالقليل , وتكاسل في العبادة

“যে বেশি বেশি মৃত্যুকে স্মরণ করবে, আল্লাহ তা‘আলা তিনভাবে তাকে সম্মানিত করবেন। (১) দ্রুত তওবা করার সুযোগ দেবেন, (২) অন্তরে প্রশান্তি এনে দেবেন, (৩) আর ইবাদতে আগ্রহ সৃষ্টি করে দেবেন। অন্যদিকে যে মৃত্যুকে ভুলে যায় সে তিনটি ক্ষেত্রে খুব ভুগবে। (১) তওবা দেরিতে করা, (২) অন্তরে শান্তির অভাব, (৩) আর ইবাদতে অলসতা।”[২৩১]

---

[২৩১] আরশিফু মুলতাকা আহলিল হাদিস : ১, ৮০/১০৩

➥ এ কারণে আমাদের সালাফরা বিভিন্নভাবে নিজেদের অন্তরে সব সময় মৃত্যুর চিন্তাকে জাগ্রত করতে চেষ্টা করতেন :

❋ তারা প্রায়ই কবরস্থানে যেতেন। যারা চলে গেছে তাদের দেখে মৃত্যুর কথা স্মরণ করতেন। ভাবতেন "আমাকেও একদিন একই পরিণতি বরণ করতে হবে।"

❋ কেউ কেউ তাদের বাড়ির নিচে গর্ত খনন করতেন। মাঝে মাঝে তারা সে গর্তে শুয়ে থাকতেন। তাদের অন্তিম পরিণতির কথা ভাবতেন।[২৩২]

❋ আর কেউ কেউ রাসূল ﷺ-এর নির্দেশ মোতাবেক দ্রুত তাদের অসীয়তনামা লিখে ফেলতেন।

রাসূল ﷺ বলেছেন,

مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَهُ شَيْءٌ يُوصِي فِيهِ، يَبِيتُ لَيْلَتَيْنِ إِلاَّ وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ

"অসীয়তযোগ্য কিছু রয়েছে এমন কোনো মুসলিমের উচিত নয় যে, সে দুরাত কাটাবে অথচ তার কাছে অসীয়ত লিখিত থাকবে না।"[২৩৩]

ইবনে উমার رضي الله عنهما বলেছেন,

مَا مَرَّتْ عَلَيَّ لَيْلَةٌ مُنْذُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ ذَلِكَ إِلاَّ وَعِنْدِي وَصِيَّتِي

"রাসূল ﷺ-এর এই হাদিস শোনার পর আমি আমার অসীয়তনামাটি ছাড়া এক রাতও কাটাইনি।"[২৩৪]

মৃত্যুকে আমরা অনেক দূরের বিষয় মনে করি। তরুণরা মনে করে, "আরে মৃত্যু! অনেক দূরের ব্যাপার। বহুত সময় বাকি আছে।" এ ধরনের মানসিকতা নিয়ে চলার কারণে গুনাহ করতে আমরা ভয় পাই না। ভাবি, "পরে তওবা করে নেব নে।" কিন্তু সে সময় আর আসে না। তারপর হুট করে একদিন মৃত্যু এসে যায়। অসীয়ত

[২৩২] যদিও আমরা এমন কিছু করতে বলি না। -শার'ঈ সম্পাদক
[২৩৩] সহীহ বুখারি, হাদিস নং : ২৭৩৮
[২৩৪] সহীহ মুসলিম, হাদিস নং : ১৬২৭

লেখার এ সুন্নাহটি জীবিত করলে শুধু যে উত্তরাধিকারীরা তাদের হক্ক পাবে তা না; বরং আমাদের নিজেদের মধ্যেও মৃত্যুভয় জাগ্রত হবে। যখন দুনিয়া আমাদের খুব বেশি ব্যস্ত করে ফেলবে, তখন অসীয়তটি পড়ার সাথে সাথে আবার আমাদের মৃত্যুর কথা স্মরণ হবে। আমরা দেখব সেখানে লেখা :

❈ "এভাবে আমাকে গোসল করিয়ো।"

❈ "আমাকে এ জায়গায় দাফন কোরো।"

❈ "আমার জানাযার সালাত যাতে আমার ভাই পড়ায়।"

সহজ করার জন্য একটি নমুনা অসীয়তনামা দিচ্ছি। আপনি এটা দিয়ে শুরু করতে পারেন। এর কিছু অংশ আপনাকে আপনার ইচ্ছা অনুযায়ী বদলাতে হবে। আর হ্যাঁ, লেখা শেষ হবার পর উকিলকে দেখানোর আগে অবশ্যই কোনো আলেমকে অসীয়তনামাটি দেখিয়ে নেবেন।

আল্লাহ তা'আলা যেন আমাদের গুনাহগুলো মাফ করে দেন। আমাদের জান্নাত দান করে দুনিয়ার অপ্রাপ্তিগুলো দূর করে দেন।

[নমুনা অসীয়তনামা]

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

আল্লাহর নাম নিয়ে শুরু করছি। সকল প্রশংসা তাঁর জন্যেই। তাঁর হাতেই সকল ক্ষমতা ও রাজত্ব। সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক শেষ নবি মুহাম্মাদ ﷺ-এর ওপর।

এ অসীয়তনামাটি (নাম) এর পক্ষ থেকে। তার বাড়ি (ঠিকানা)।

আমি আমার পূর্বের সকল অসীয়তনামা এবং এ সংক্রান্ত সকল সাক্ষ্য বাতিল ঘোষণা করছি।

আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি আল্লাহ ছাড়া কোনো সত্য ইলাহ নেই। তিনি এক ও অদ্বিতীয়। তাঁর কোনো শরীক নেই। তিনি পরম দয়াময়। তিনিই আসমান ও জমিনে যা কিছু আছে সবকিছুর সৃষ্টিকর্তা। তিনি ইব্রাহিম عليه السلام, মূসা عليه السلام, ঈসা عليه السلام ও মুহাম্মাদ ﷺ-সহ সকল নবির স্রষ্টা। তাঁদের তিনি এ পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন মানুষকে অন্ধকার থেকে আলোতে নেয়ার জন্যে। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, মুহাম্মাদ ﷺ তাঁর

বান্দা ও রাসূল। মুহাম্মাদ ﷺ হচ্ছেন শেষ নবি। আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি, জান্নাত সত্য। জাহান্নাম সত্য। আমাদের সামনে যে কিয়ামত আসছে সেটাও সত্য। এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ-ই নেই যে, মৃত্যুর পরে আল্লাহ তা'আলা প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত সকল প্রজন্মের মানবজাতিকে আবার জীবিত করবেন।

আমি আমার আত্মীয়, বন্ধু ও আমার সকল মুসলিম ভাই-বোনদের নসীহা করছি, যারা আমার পরে বেঁচে থাকবে তারা যেন সত্যিকারের মুসলিম হিসেবে বাঁচার চেষ্টা করে। তারা যেন আসমান ও জমিনের স্রষ্টা আল্লাহ তা'আলার কাছে নিজেকে সমর্পিত করে। আর তাঁকে যথাযথভাবে ভয় করে। তারা যেন সবকিছুর চেয়ে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ﷺ-কে বেশি গুরুত্ব দেয়। বেশি ভালোবাসে। তাঁরা যেন জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে রাসূল ﷺ-কে অনুসরণ করে।

আমি তাঁদের স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি, সবাইকেই তার জন্য যে সময় বেঁধে দেয়া হয়েছে, সে সময়েই মরতে হবে। এর আগেও না, পরেও না। আমাদের জন্মের বহু আগেই এটা লিখিত হয়ে গেছে। মৃত্যু তাদের জন্য চরম দুর্ভোগ ডেকে আনে যারা এর সম্পর্কে বেখবর থাকে। এর জন্য প্রস্তুতি নেয় না। তাই আমার মৃত্যুর জন্য বেশি দুঃখিত হয়ো না। মনে রেখো, একদিন তোমাকেও আমার পরিণতি বরণ করতে হবে। নিজের মৃত্যুর জন্য প্রস্তুতি নাও। মৃত্যু খুবই নিকটে।

তোমরা ধৈর্য ধরবে। ইসলাম নারী ও পুরুষদের সর্বোচ্চ তিন দিন শোক করার অনুমতি দেয়। অবশ্য একজন বিধবাকে তার ইদ্দতের সময় পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। বিলাপ করে কান্নাকাটি করা, মাত্রাতিরিক্ত শোক প্রকাশ করা ইসলামে নিষিদ্ধ। আমার জন্যে তোমরা এমনটা করবে না। কেউ করলে বাঁধা দেবে।

আমি আমার আত্মীয়স্বজন, বন্ধুসহ সবাইকে অনুরোধ করছি, নিজেরা বিশ্বাস করুক আর না করুক, তারা যেন আমার বিশ্বাসকে সম্মান করে। তারা যেন আমার নির্দেশনাগুলোকে সম্মান করে আর আমি অসীয়তনামায় যা যা লিখে যাচ্ছি তা পরিবর্তনের চেষ্টা না করে। তারা যেন আমাকে সেভাবেই দাফন করে যেভাবে আমি চেয়েছি। সেভাবেই আমার সম্পদ বণ্টন করে, যেভাবে আমি চেয়েছি। তারা যেন আল্লাহ তা'আলাকে ভয় করে। নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা কোনো জুলুমকারীকে ভালোবাসেন না।

৫. জানাযা ও দাফনের ব্যাপারে :

যারা আমাকে মরতে দেখবে, তারা যেন আমাকে বারবার শাহাদাহ্ পড়ার কথা মনে করিয়ে দেয়। আমি আমার আত্মীয়দের নির্দেশনা দিচ্ছি, তারা যেন ইসলামি শরিয়াহ্ অনুযায়ী আমার গোসল দেয়, জানাযা পড়ায় আর দাফন দেয়। মৃত্যুর সাথে সাথেই যত দ্রুত সম্ভব আমায় যেন দাফন দেয়া হয়। অবশ্যই আমার লাশে যেন কোনো ময়নাতদন্ত করা না হয়। আর যদি ময়নাতদন্ত ছাড়া কোনো উপায় না থাকে, তবে সেটা যেন 'MRI Scan'-সহ করা হয়। আমার বাবার কবরের কাছাকাছি যেন আমায় দাফন করা হয়।

আমি জানি, এসব কিছু অক্ষরে অক্ষরে পালন করা তোমাদের জন্য কঠিন। তবে তোমাদের প্রতি অনুরোধ থাকবে, তোমরা এসব কিছু মানার সর্বোচ্চ চেষ্টা করবে। পরিস্থিতির কারণে যদি কোনো ছাড় দেয়ার প্রয়োজন পড়ে, তবে অন্তত মৌলিক বিষয়াদিতে কোনো ছাড় দেবে না।

৬. সম্পদের ব্যাপারে :

আমি অনুরোধ করছি, আমার সকল ঋণ যেন দ্রুত শোধ করে দেয়া হয়। আমার ঋণসংক্রান্ত সবকিছু লেখা আছে (জায়গার নাম) এবং (নাম) ও (নাম) এ ব্যাপারে অবগত যে, কার কার কাছে আমি কত টাকা ঋণগ্রস্ত। আমি তাদের মানুষের হক্ব ফিরিয়ে দেয়ার দায়িত্ব দিয়েছি। তারা চাইলে অন্য কাউকে এর জন্যে মনোনীত করতে পারে।

আমি আমার মোট সম্পদের এক-তৃতীয়াংশ যা কিনা (টাকার পরিমাণ) সদকায়ে জারিয়া হিসাবে দান করতে বলে যাচ্ছি। আশা করছি, এতে করে কবরে আমি স্বস্তি পাব।

ইসলামের উত্তরাধিকার আইন অনুযায়ী যেন আমার অবশিষ্ট সম্পদ বণ্টন করা হয়। সবশেষে আমি আমার পরিবারের সবাইকে, আমার বন্ধু-বান্ধব ও কাছের মানুষদের অনুরোধ করছি, তারা যেন আমার জন্য বেশি বেশি দু'আ করে। তারা

যেন আল্লাহর কাছে আমার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে। যেসব মুসলিম আমাকে নিয়ে বাজে কথা বলেছে, আমাকে কষ্ট দিয়েছে, আমি তাদের ক্ষমা করে দিলাম। একইভাবে, আমি যাদের কষ্ট দিয়েছি, তাদের কাছে ক্ষমা চাচ্ছি। তারা যেন আমাকে ক্ষমা করে দেয়।

৫. নির্বাহক মনোনয়ন :

আমি (নাম)-কে, বাড়ি (ঠিকানা) এবং (নাম)-কে, বাড়ি (ঠিকানা); আমার অসীয়তের নির্বাহক হিসেবে মনোনীত করছি। তাদের অনুরোধ করছি, অসীয়তে যা যা লেখা আছে তা ঠিক সেভাবেই বাস্তবায়ন করার।

এ অসয়ীতনামাটি স্বাক্ষর করছি....................সালে।

আমার স্বাক্ষর :

প্রথম সাক্ষীর স্বাক্ষর :	দ্বিতীয় সাক্ষীর স্বাক্ষর :
নাম :	নাম :
ঠিকানা :	ঠিকানা :
পেশা :	পেশা :

সুন্দর শেষের অপেক্ষায়

ইতিহাস নিয়ে যারা একটু পড়াশোনা করেছেন তারা ক্রুসেড যুদ্ধে যখন খ্রিষ্টানদের হাতে জেরুজালেমের পতন হয়েছিল কিংবা স্পেনে মুসলিমদের পতনের পর সেখানে কী নাজুক পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছিল, সে সম্পর্কে বেশ ভালোমতোই জানেন। মুসলিমদের রক্তের বন্যায় সে এলাকাগুলো প্লাবিত হয়েছিল। বহু মুসলিম প্রাণের ভয়ে দেশ ত্যাগ করেছিল। আর বাকিরা নিজ ধর্ম ত্যাগ করে হয়ে গিয়েছিল খ্রিষ্টান।

তারপর অনেক দিন চলে গিয়েছে। এখন হয়তো মুসলিমদের আর অস্ত্রের মুখে ধর্ম ত্যাগ করতে বলা হয় না, তবে আল্লাহর শত্রুরা কিন্তু বসে নেই। তাঁরা ইসলামের বিরুদ্ধে বইয়ের পর বই লিখে যাচ্ছে। রাসূল ﷺ-এর নিষ্পাপ চরিত্রে কালিমা লেপনের চেষ্টা করছে। টাইম ম্যাগাজিন বলছে, দেড় শ বছর সময়ের ব্যবধানে (১৮০০ থেকে ১৯৫০) ইসলামের বিরুদ্ধে ষাট হাজারেরও বেশি বই লেখা হয়েছে। অর্থাৎ, প্রতিদিন একটিরও বেশি বই লেখা হয়েছে।[২৩৫]

অনলাইনে-অফলাইনে এসব অপপ্রচার ইচ্ছায়-অনিচ্ছায় আমাদের চোখে পড়ছে। যেহেতু ইসলাম নিয়ে আমরা বেশির ভাগই নিয়মতান্ত্রিক পড়াশোনা করি না, তাই এসব দেখে খুব সহজেই বিভ্রান্ত হয়ে যাই। ঈমান নিয়ে সংশয়ে পড়ে যাই। শয়তান আর তাঁর অনুসারীরা এভাবেই আমাদের জীবনের সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ দীন ইসলামকে ঝুঁকির মুখে ফেলে দিয়েছে।

---

[২৩৫] http://content.time.com/time/magazine/0,9263,7601790416,00.html

সন্দেহ নেই আমাদের সময়ে ঈমান নিয়ে বেঁচে থাকতে হলে এসব ফিতনা থেকে যথাসম্ভব গা বাঁচিয়ে চলতে হবে। বেশি বেশি জ্ঞানার্জন করতে হবে। মনে রাখতে হবে, এ ব্যাপারটির সাথে আমার অনন্তকালের শান্তি অথবা অনন্তকালের শাস্তি জড়িত। হুট করে কোনো সিদ্ধান্ত নেয়া যাবে না। আল্লাহর কাছে সাহায্য চাইতে হবে।

সন্দেহ জিনিসটা খুব দূষিত। একবার মনের ভেতরে ঢুকে গেলে সহজে বের হতে চায় না। যখন আমরা একা থাকি শয়তান তখন আমাদের মন নিয়ে খেলা করে। এমন এমন সব চিন্তা ঢুকিয়ে দেয় যা মুখে উচ্চারণ করতেও আমরা ঘৃণা করি।

তবে আমাদের জেনে হয়তো ভালো লাগবে, সাহাবিরাও শয়তানের ওয়াসওয়াসার শিকার হতেন। তারা রাসূল ﷺ-কে বলেছিলেন, “আমাদের মনে এমন সব চিন্তা আসে, যা মুখে আনাও আমরা জঘন্য পাপ মনে করি।” রাসূল ﷺ তাদের বলেছিলেন,

ذَاكَ صَرِيحُ الإِيمَانِ

“এটা সুস্পষ্ট ঈমানের চিহ্ন।”[২৩৬]

ইমাম নববী রহিমাহুল্লাহ লিখেছেন,

> “রাসূল ﷺ ‘এটা সুস্পষ্ট ঈমানের চিহ্ন’ বলতে সাহাবিদের বুঝিয়েছেন; তোমরা শয়তানের এই ওয়াসওয়াসাকে যে ঘৃণাযোগ্য ভেবেছ, এটাই তোমাদের মধ্যকার ঈমানের চিহ্ন প্রকাশ করেছে। কারণ, তোমরা এটা উচ্চারণ করতেও সাহস পাওনি। বিশ্বাস করা দূরে থাকুক, তোমরা এটা বলতেও ভয় পেয়েছ। এমনটা তার ক্ষেত্রেই হওয়া সম্ভব যার যথাযথ ঈমান রয়েছে।”[২৩৭]

অনেকে হয়তো বলবেন, “এটা কেমন কথা? যথাযথ ঈমান থাকলে সন্দেহ আসবে কোথা থেকে?” এ প্রশ্নের উত্তর আমাদের একজন সালাফ দিয়েছেন। একবার একজন তার কাছে গিয়ে বলেছিল, “ইহুদি-খ্রিষ্টানরা বলে, ‘আমরা কোনো

[২৩৬] সহীহ মুসলিম, হাদিস নং : ১৩২
[২৩৭] শরহু মুসলিম : ২/১৫৪

ওয়াসওয়াসা অনুভব করি না'।" তিনি তখন বলেছেন,

صَدَقُوا وَمَا يَصْنَعُ الشَّيْطَانُ بِالْبَيْتِ الْخَرَابِ

"তারা ঠিকই বলেছে! যে বাড়ি ধ্বংস হয়ে গেছে, তাতে আক্রমণ করে শয়তানের লাভটা কী?"[২৩৮]

তাই আজ থেকে যদি শয়তানের ফিসফাস শুনতে পান, তবে নিজের ঈমান নিয়ে সন্দেহে পড়ে যাবেন না; বরং মনে করবেন আপনার মধ্যে ঈমান আছে বলেই শয়তান আপনাকে এভাবে জ্বালাচ্ছে। মনের ভেতর খচ খচ করলে কোনো আলেমের শরণাপন্ন হয়ে তাকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করুন। দয়া করে আল্লাহর শত্রুদের কাছ থেকে ইসলাম শিখবেন না।

পাশাপাশি এটাও মাথায় রাখবেন, ইসলামের কিছু কিছু বিষয় আছে যা সম্পূর্ণ বিশ্বাসের। সেখানে যুক্তি খাটানো যায় না। খাটানো উচিতও না। তাই ইসলামের সবকিছু যুক্তি দিয়ে বিচার করতে চেষ্টা করবেন না। এমনটা করতে চাইলে, শয়তান আপনাকে আবার সন্দেহে ফেলে দেবে।

রাসূল ﷺ বলেছেন, "শয়তান তোমাদের কাছে আসে, আর জিজ্ঞেস করে, 'তোমাকে কে সৃষ্টি করেছে?' সে বলে, 'আল্লাহ।' শয়তান এরপর বলে, 'আল্লাহকে কে সৃষ্টি করেছে?' তোমাদের কারও এমন অবস্থা হলে সে যেন বলে,

آمَنْتُ بِاللَّـهِ وَرُسُلِهِ

'আমি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের ওপর ঈমান রাখি।'

তখন সে শয়তান চলে যাবে।"[২৩৯]

আমাদের মাথায় রাখতে হবে, মৃত্যুর আগ পর্যন্ত শয়তান সব সময় চাইবে আমাদের ঈমানহারা করতে। রাসূল ﷺ তাই আল্লাহর নিকট দু'আ করতেন,

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الهَدمِ ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ التَّرَدِّي ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الغَرَقِ وَالحَرَقِ وَالهَرَمِ ،

[২৩৮] মজমু ফতওয়া : ২২/৬০৯
[২৩৯] মুসনাদে আহমাদ, হাদিস নং : ২৬২০৩

وَأَعُوذُ بِكَ أَن يَتَخَبَّطَنِي الشَّيطَانُ عِندَ المَوتِ ، وَأَعُوذُ بِكَ أَن أَمُوتَ فِي سَبِيلِكَ مُدبِرًا ، وَأَعُوذُ بِكَ أَن أَمُوتَ لَدِيغًا

"হে আল্লাহ, আমি তোমার কাছে আশ্রয় চাই কোথাও চাপা পড়া থেকে, ওপর থেকে পড়ে যাওয়া থেকে, ডুবে যাওয়া থেকে, পুড়ে যাওয়া থেকে, প্রচণ্ড বার্ধক্যে উপনীত হয়ে যাওয়া থেকে। আমি তোমার কাছে আশ্রয় চাই যেন শয়তান মৃত্যুর সময় আমার ওপর নিয়ন্ত্রণ নিয়ে আমাকে সংশয়ে না ফেলতে পারে। আমি তোমার কাছে আশ্রয় চাই; সারা জীবন তোমার পথে লড়ে, শেষ সময়ে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে মারা যাওয়া থেকে। আর আমি তোমার কাছে আশ্রয় চাই বিষধর হুল কিংবা কামড়ে মারা যাওয়া থেকে।"[২৪০]

সারা জীবন আল্লাহর রাস্তায় লড়ে, মানুষকে আল্লাহর পথে ডেকে শেষ সময়ে যদি আমাদের ঈমানহারা অবস্থায় মরতে হয় এর চেয়ে আফসোসের আর কী হতে পারে?

ইমাম ইবনে তাইমিয়া ﵀ বলেছেন, "মৃত্যুর সময় শয়তান আদমসন্তানকে সবচেয়ে বেশি প্ররোচিত করতে চায়। কারণ, এ সময়টা খুব গুরুত্বপূর্ণ। রাসূল ﷺ বলেছেন,

الأَعمَالُ بِخَوَاتِيمِهَا

'শেষ কীভাবে হয়েছে তা দিয়েই আমল বিচার করা হয়।'[২৪১]

তিনি আরও বলেছেন, 'একজন মানুষ হয়তো (মানুষের দৃষ্টিতে) জান্নাতী লোকদের মতো ভালো কাজ করতে পারে। একসময় এমন হয় যে, তার আর জান্নাতের মধ্যে কেবল এক হাত ব্যবধান। এমন সময় তাকদীর তার ওপর প্রাধান্য বিস্তার করে আর অমনি সে জাহান্নামীদের মতো আমল শুরু করে দেয়। ফলে সে জাহান্নামে প্রবেশ করে। আরেকজন (মানুষের দৃষ্টিতে) জাহান্নামীদের মতো আমল করতে থাকে। এমনকি তার আর জাহান্নামের মধ্যে তখন কেবল এক হাত ব্যবধান থাকে। এমন সময় তাকদীর তার ওপর প্রাধান্য বিস্তার করে আর তখন সে

[২৪০] আবু দাউদ, হাদিস নং : ১৫৫২
[২৪১] সহীহ বুখারি, হাদিস নং : ৬৪৯৩

জান্নাতীদের আমল করা শুরু করে দেয়। ফলে সে জান্নাতে প্রবেশ করে।'[২৪২]

তাই বলা হয়ে থাকে, মৃত্যুর সময়েই শয়তান আদমসন্তানের সবচেয়ে বেশি ক্ষতি করতে চায়। সে তার সহচরদের বলে, 'একে ভালোমতো ধরো। এ যদি এখন তোমার হাত থেকে ফসকে যায়, আর কখনোই তুমি একে পাবে না'।"[২৪৩]

ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বাল ﵀ যখন মারা যাচ্ছিলেন, তখন তার ছেলে ছিল তার পাশে বসা। তার ছেলে হঠাৎ শুনতে পেল বাবা বলছে, "না, এখনো না। না, এখনো না।" তিনি বেশ কয়েকবার এমন বললেন। ছেলে বাবাকে এটা বলার কারণ জিজ্ঞেস করলে আহমাদ ইবনে হাম্বল বললেন, "শয়তান আমার পাশে দাঁড়িয়ে ছিল। সে নিজের আঙুল কামড়াচ্ছিল আর বলছিল,

يا أحمد فُتَّنِي

"আহমাদ! তুমি তো আমার হাত থেকে ফসকে যাচ্ছ (আমি তো তোমাকে পথভ্রষ্ট করতে পারলাম না)!"

আর তাই আমি বললাম,

لا بعد ، لا حتى أموت

"না, এখনো না। যতক্ষণ পর্যন্ত না মারা যাচ্ছি, ততক্ষণ পর্যন্ত না।"[২৪৪]

তাই আমাদের উচিত আল্লাহর নিকট সব সময় দু'আ করা যাতে তিনি আমাদের মুসলিম হিসেবে মৃত্যু দান করেন। ফির'আউনের জাদুকররা আল্লাহর নিদর্শন দেখে ঈমান আনার পর দু'আ করেছিল। ফির'আউনকে উদ্দেশ্য করে বলেছিল,

وَمَا تَنْقِمُ مِنَّا إِلَّا أَنْ آمَنَّا بِآيَاتِ رَبِّنَا لَمَّا جَاءَتْنَا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ

"তুমি আমাদের থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করছ শুধু এ কারণে যে, আমরা আমাদের রবের আয়াতসমূহের প্রতি ঈমান এনেছি, যখন তা আমাদের

[২৪২] সহীহ মুসলিম, হাদিস নং : ২৬৪৩
[২৪৩] মাজমু ফতওয়া : ৪/২৫৫
[২৪৪] তাদকিরাহ : ১/১৮৬

কাছে এসেছে। হে আমাদের রব, আমাদের জন্যে ধৈর্যের দ্বার খুলে দাও এবং মুসলিম হিসাবে আমাদের মৃত্যু দান করো।”[২৪৫]

জীবনের লম্বা একটা সময় কাছের মানুষদের ভালোবাসা থেকে বঞ্চিত হয়ে ইউসুফ عليه السلام দু আ করেছিলেন :

رَبِّ قَدْ آتَيْتَنِي مِنَ الْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِي مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَنْتَ وَلِيِّي فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ تَوَفَّنِي مُسْلِمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ

“হে আমার রব, তুমি আমাকে রাজত্ব দান করেছ। স্বপ্নের ব্যাখ্যা শিখিয়েছ। হে আসমানসমূহ ও জমিনের স্রষ্টা! দুনিয়া ও আখিরাতে তুমিই আমার অভিভাবক। আমাকে মুসলিম অবস্থায় মৃত্যু দাও আর নেককারদের সাথে আমাকে যুক্ত করো।”[২৪৬]

আমাদের সবাইকেই মরতে হবে। সেটা আজ হোক বা কাল। আল্লাহ্ তা‘আলা যেন জীবিত থাকা অবস্থায় আমাদের শয়তানের সকল ষড়যন্ত্র মোকাবেলার শক্তি দেন। আর যখন মৃত্যুর আসবে, তখন শয়তানের সকল ফিতনাকে পাশ কাটিয়ে আমাদের একটি সুন্দর মৃত্যু দান করেন। নশ্বর এই পৃথিবীতে আমাদের মুখ থেকে বের হওয়া শেষ কথাটি যেন হয় : [২৪৭]

لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّـهُ

[২৪৫] সূরা আল আরাফ, ৭ : ১২৬

[২৪৬] সূরা ইউসুফ, ১২ : ১০১

[২৪৭] রাসূল ﷺ বলেছেন, “যার শেষ কথা হবে ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।” (আবু দাউদ, হাদিস নং : ৩১১৬)

সমর্পণ এর প্রকাশিত বইসমূহ

বিশ্বাসের যৌক্তিকতা | ডা. রাফান আহমেদ

সংবিৎ | জাকারিয়া মাসুদ

অ্যান্টিডোট | আশরাফুল আলম সাকিফ

অন্ধকার থেকে আলোতে | মুহাম্মাদ মুশফিকুর রহমান মিনার

জীবনের সহজ পাঠ | রেহনুমা বিনত আনিস

রৌদ্রময়ী | ১৬ জন লেখিকা

সালাহউদ্দীন আইয়ুবী (রহ.) | শাইখ আবদুল্লাহ নাসিহ উলওয়ান (রহ.)

হারিয়ে যাওয়া মুক্তো | শিহাব আহমেদ তুহিন

হুজুর হয়ে হাসো কেন? | হুজুর হয়ে টিম

প্রকাশিতব্য বইসমূহ

বাতায়ন | মুসলিম মিডিয়া

অংশু | হোসাইন শাকিল

শিশুতোষ সিরিজ | সংস্কারকবৃন্দ

ইসলামে রিযিকের ধারণা | মুফতী আব্দুল্লাহ মাসুম

কে তোমার রব?

কে তোমার নবি?

কী তোমার দ্বীন?

জাতীয়তাবাদ

বিয়ে